ছিন্নমূল

ছিন্নমূল

MAHMUD SHAH QURESHI
MSQ

ছিন্নমূল

মূল :
টমাস এ. ডুলি

অনুবাদ :
মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

খোশরোজ কিতাব মহল
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১৫. বাংলাবাজার : ঢাকা

প্রকাশক
মহীউদ্দীন আহমদ
খোশরোজ কিতাব মহল
১৫ বাংলাবাজার : ঢাকা

প্রথমপ্রকাশ
সেপ্টেম্বর : ১৯৫৮
মূল্য : দুই টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রাকর
লুৎফর রহমান
জাতীয় মুদ্রণ
১০৯, হৃষিকেশ দাস রোড : ঢাকা

Bengali version of Deliver Us From Evil by Thomas A. Dooley. Original edition in English published by Farrar, Straus and, Cudahy, New York. Copyright 1956 by Thomas A Dooley.

প্রথম অধ্যায়

হিকহাম ফিল্ড এয়ার পোর্ট প্রান্ত সৈন্য সামন্ত ও তাদের পরিবার পরিজনে ভর্তি। হাওয়াই শহরে এই নবেম্বর মাসটা ভারি চমৎকার। পাতলা ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টি হতো। আর সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের চেহারা যেতো বদলে। মায়াময় হয়ে উঠতো চারদিক। আর আমি যাচ্ছিলাম বাড়ী। হ্যাঁ, আমি তখন দেশের পথে। হাওয়াইয়ে দু'হপ্তা অবস্থান আমার বিদেশ বাসের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। বেশ দ্রুতগতিতেই আমি চলছিলাম। এসময় আমার জীবনে আসে দু'টি মহৎ মুহূর্ত। দ্বিতীয় মুহূর্ত আসে এই হিকহাম ফিল্ডে।

প্রথম দৃশ্যের ঘটণাস্থল পার্ল হার্বার। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণপোতগুলোর সদরদপ্তরে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর যে 'কম্যাণ্ড কনফারেন্স রুম' ছিলো, সেখানে। এডমিরাল ফেলিকস বি, স্টাম্পের কর্মচারীদের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। এডমিরাল স্টাম্প হলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। আর আমি একজন নগন্য আটাশ বছর বয়সের লেফটেনাণ্ট (এখন জুনিয়ার গ্রেড)। বলতে গেলে কিছুরই কম্যাণ্ডে ছিলাম না। কিন্তু প্রাচ্যে আমার ওপর দায়িত্ব ছিলো যথেষ্ট। ইন্দোচীনের উত্তর ভিয়েৎনামে হাইপঙ শহরে আমি প্রেরিত হই। সেই যে ছয় লক্ষ ভিয়েৎমীন 'স্বাধীনতার পাড়ি' জমিয়েছিল কম্যুনিষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামে—তাদের নানা প্রকার সাহায্য দানই ছিলো আমার কাজ।

ইন্দোচীন ছিলো একটি ফরাসী উপনিবেশ। আট বছরের রক্তাক্ত ঔপনিবেশিক আর গৃহযুদ্ধের পর উনিশ শো চুয়ান্ন সালের সাতই মে দিয়েন বিয়েন ফু'র মূল দুর্গের কর্তৃত্বভার চলে যায় কম্যুনিষ্টদের হাতে। এর কিছু পরেই এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইচ্ছাকৃতভাবে তাতে এই ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দেশের অবিভাজ্য রূপ লোপ পায়। কম্যুনিষ্ট বিজয় স্বীকৃতি লাভ করে। চুক্তির একটি শর্ত ছিলো, উত্তরের অকম্যুনিষ্ট বাশিন্দারা ইচ্ছে করলে দক্ষিণে চলে যেতে পারে। ওরা তাই করতে চাইলো।

এক জন দু'জন নয়, শত-সহস্র ভিয়েৎনাম বাসী বাস্তুত্যাগ করলো। তাদের বেশীর ভাগকেই পাড়ি দিতে হলো হাইপঙের উপর দিয়ে। ঠিক সেই খানেই আমি ছিলাম। এডমিরাল স্টাম্পের কর্মচারীগণ হাই পঙের ঘটণাবলীর বিস্তৃত রিপোর্ট পেতেন। সম্ভবতঃ সেখানে ডুলী নামধেয় জনৈক আইরিশ আমেরিকান ডাক্তারের উল্লেখও প্রচুর রয়েছে। কিন্তু ওরা চাইলো আরো বেশী কিছু জানতে। কোনো ওজর-আপত্তিই কানে তুললেন না এডমিরাল। তাই বাড়ী ফেরার পথে কিছু শুনিয়ে যেতে আদিষ্ট হলাম। শুনিয়ে যাওয়া তো নয়, আসলে পুরোদস্তর বক্তৃতা। তারকাধারীদের জমায়েত হবার কামরায় আমাকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আশি জন অফিসারের সামনে বক্তৃতা করছিলাম। লক্ষ্য করলাম, সামনের সারির ষোলো জনের কলারই তারকা শোভিত। পরের কয়েক সারিতে ক্যাপ্টেনরা। কমাণ্ডাররা আছেন পেছনের সারিগুলোয়।

পদমর্যাদার জন্যে আমি ভড়কে যাইনি। তবে আমার মতো নগন্য লোকের সামনে এতোসব জাঁদরেল ব্যক্তির বেশে কিছুটা ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবু উত্তর ভিয়েৎনামের সন্ত্রাসবাদী এলাকা থেকে বাস্তুত্যাগরত অযুত মোহাজেরদের কাহিনী বর্ণনা করে গেলাম। আমরা কী কী উপায়ে তাদের সাহায্য করছিলাম তাও সবিস্তারে বলছিলাম। অসংখ্য মুমূর্ষু নরনারী আর শিশুর জন্যে হাইপঙের অপর তীরের বেম্বো কারন্টেইন পেরিয়ে পালিয়ে আসছিলো। আর যারা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে বিফল হলো তাদের কথা শুনলাম। হাইপঙের বড়ো বড়ো ক্যাম্পগুলোতে যে 'মেডিক্যাল এইড' দিতাম সেসব কথা বললাম ওঁদের। বলে চললাম, কী করে ওরা ছোট্ট পানসীতে বোঝাই করে কম্যুনিষ্ট অধিকৃত নদীর উপর দিয়ে মার্কিন জাহাজে চলে আসতো। তারপর দু'দিন তিন রাতে হাজার মাইল পেরিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাইগণ শহরে হাজির হতো। দক্ষিণ চীনের সামুদ্রিক এলাকায় মৌসুমী বৃষ্টির রাতে তাঁবুর ভেতর বসে যে সব ভয়াবহ কাহিনী শুনেছিলাম, তার কয়েকটা ঝাড় দিলাম। ওঁদের কয়েকটা অভিযোগের জবাব ও আমায় দিতে হলো। কোনো কোনো মিশন সুচারুরূপ কাজ করতে পারলো না কেন? মার্কিন নৌ-নীতি অমুক সমুক ভাবে পরিচালিত হয়েছিল কেন? এ সবের জবাবে শুধু ঘন্টাখানেক আমায় বকে যেতে হয়েছিল। ওঁরা অবশ্য সাগ্রহেই সব শুনছিলেন।

আমার মনে হয়, শ্রোতার উপর বক্তার ব্যক্তিত্ব তাঁর বক্তৃতার পরবর্তী প্রশ্নের সময়ানুপাতের উপর নির্ভরশীল। আমি নিশ্চয়ই বেশ ব্যক্তিত্ব ফলাতে পেরেছিলাম। কারণ প্রশ্নোত্তরের পালা সত্তর মিনিটের উপর চলেছিলো। অবশেষে সামনের সারির তিনজন তারকাধারী বলে উঠলেন, "বহুত আচ্ছা ডক্টর ডুলী, তোমার বক্তৃতায় বেশ চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে। সাহস ও মহত্বের অনেক বাস্তব কাহিনীও তুমি শুনিয়েছো। আপত্তিও করেছো কোনো কোনো ব্যাপারে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তুমি কিছু বললে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে অংশ এখনো স্বাধীন রয়েছে তার জন্যে আমাদের কী কর্তব্য? এ প্রশ্নের কোনো সমাধান তো দিলে না।" তাও দিলাম, হয়তো একটু অশোভনভাবেই তা দিলাম। দু'টি ছোট্ট ডোরা কাটা চিহ্নধারী একজন বড়ো তারকাধারী তিনজনকে কোনো সমাধান দিতে যাওয়া (অবশ্যি সমাধান দেবার কিছু যদি থেকে থাকে) বাতুলতা ছাড়া আর কী। আমার কাজ তো শুধু ফোঁড়া কাটা আর পিটের বেদনা সারানো।

তারপর আসা যাক হাওয়াইয়ে আমার সেই প্রথম স্মরণীয় মুহূর্তের কথায়। সেই ওয়াল্টার মিটির স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা। নৌ-বাহিনীর জন্ম থেকে প্রতিটি যুদ্ধে কর্মচারী যে স্বপ্ন দেখে থাকে। জাহাজে খাবার-ঘরে খেতে বসে কতো সময় বলে উঠেছি: "আঃ, এই সাজ যদি আমার গায়ে চড়াতে পারতাম! ···কখনো বা বলেছি, "এডমিরাল ব্যাটা এভাবে পরে কেন?" একদা এডমিরাল আমায় শুধিয়ে বসলেন, "আচ্ছা ডুলী, তারকাধারী হলে তুমি কী করতে?"

সনাতন নিচু স্তরের কয়েকটা মতামত ব্যক্ত করে আমি ব্যাপারটাকে সহজভাবে গ্রহণ করলাম। আমি বললাম, "স্যার, এশিয়ার তীরবর্তী সব মার্কিন অফিসারদের সব সময় ইউনিফর্ম পরে থাকা উচিত। আর আমাদের সাহায্য দ্রব্যগুলো ভালো করে চিহ্নিত করা কর্তব্য। তাছাড়া আমি মনে করি, এশিয়ায় গণতন্ত্রের সত্যিকার সংজ্ঞা প্রচার করা আমাদের উচিত। কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে এশিয়াবাসীরা যে সব সংজ্ঞা পায় তার চাইতে পরিষ্কার করে আর আকর্ষণীয় করে আমাদের প্রচার করা উচিত।" আরো অনেক কিছু বলেছিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে গেলে, এখন সব কথা মনে করতেও পারছিনা। এমন কি বলবার সময়ও নিজের মুরুব্বীসুলভ ব্যবহারে নিজেই বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম। কথা শেষ হবার পর

শ্রোতার কাছ থেকে প্রসংশাসূচক কিছু শুনলাম না। তিনি সংক্ষেপে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, ডকটর।" এরপর একটা শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করলেন। সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সামনে হাওয়াইয়ে আমার আবার বক্তৃতা করতে বলা হলো। আমি ছাড়া একটি মাত্র লোক আমার সব বক্তৃতা-অনুষ্ঠানগুলোতে হাজির থাকতো। সে হতভাগাটার নাম এনসাইন পট্স। মার্জিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। পাঁচ মাস সে আজ এন্নাপলিসের বাইরে। হাওয়াইয়ের এই বক্তৃতা সফরে সে আমার অগুণতি জিনিষ-পত্র সামলানোর জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলো। এনসাইন পটস সব সময় আমার উদ্দেশ্যকে বিফল করে দিতো। আমি বাইরে থেকে ফিরলে সংগে সংগে সে স্যালিউট ঠুকতো। নেভীকারে বেরুলে সে আমার সংগে না বসে ড্রাইভারের সংগে সামনের সারিতে বসতো। কখনো পেছনে বসবার জন্যে বললে সে জবাব দিতো: "নো, থ্যাঙ্কইউ, স্যর, আমার পেছনে বসাই ভালো বলে মনে করি।"

একদিন সন্ধ্যা বেলায় বক্তৃতা করে ফিরেছি। তাকে বললাম, বীচে এসে আমার সংগে সাঁতার কাটতে। সে জবাব দিলো: "ধন্যবাদ স্যর, আমি বরং অফিসারদের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যাই।'

বাড়ী ফেরবার পথে হিকহাম্ চিমাহ বাহিনীর উপনিবেশে তাকে আবার বললাম, পেছনে আমার সংগে বসতে। এবারও সে 'নো থ্যাঙ্কইউ, স্যর' বলে উড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সে সুযোগ আর দিলাম না। আমার ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ডিংগিয়ে যাচ্ছিল। বলে ফেল্লাম, "মিঃ পট্স, পেছনে এসে বসুন। আপনার সংগে কিছু কথা বলতে চাই। জেনে রাখুন, এটা আমার আদেশ।"

নিতান্ত অনিচ্ছায় বেয়াড়াভাবে সে পেছনে এসে বসল।

"পট্স, দ্যাখো, তোমার হয়েছে কী বলো দিকিনি? না, আমি কোন অপরাধ করেছি। সবার সংগে আমি ভালো ব্যবহারই তো করি। কিন্তু তুমি যেন আমায় পছন্দ করো না, এ্যাঁ, ব্যাপারটা কী, খুলে বল।"

"আমি খোলা-খুলি বলতে পারি, স্যর?"

"স্বচ্ছন্দে।"

'তাহলে বলি স্যর," সে শুরু করলো, "আপনার অনুমতি নিয়েই বলছি স্যর, আপনার সংগে থেকে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। অযুত

দুঃস্থ, এতিম, মানুষ আর চীনা জাহাজের মানুষগুলোর সম্পর্কে সগর্বে আপনি যা বলছেন, তাতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। আর আপনি যাদের আপনার কথা বিশ্বাস করছে ভাবছেন, তারা আরও বেশী অতিষ্ঠ।"

এনসাইন পটস প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার জন্যে এক মুহূর্ত থামলো। যখন দেখলো, তার কথা আমি শুনছি, সে আবার বলে চলল: "আপনি সম্প্রীতির কথা বলছিলেন, বলছিলেন কম্যুনিষ্ট জিঘাংসার বিরুদ্ধে ঘৃণা দিয়ে নয়, অত্যাচারকে আরো বেশী অত্যাচার দিয়ে নয়, কম্যুনিষ্ট ধ্বংস-যজ্ঞের বিরুদ্ধে আনবিক শক্তি প্রয়োগ করে আমরা যুদ্ধ করবো না। আপনি সম্প্রীতি, পারস্পরিক বোঝাপাড়া, সাহায্য-সূত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কথা প্রচার করছিলেন। কিন্তু নৌবাহিনীর কাজ তা নয়। এই বিশ্রি দুনিয়ায় আমাদের উপর বর্তেছে সামরিক দায়িত্ব। হৃদয়গত কোনো দুর্বলতার পরিচয় না দিয়ে, কঠোরভাবে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করে যাবো। এই জন্যেই আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আপনার কথায় কোন কাজ হবে, আমার মনে হয় না। আমি বিশ্বাস করি, এর একটি সদুত্তর আছে—সে হচ্ছে প্রতিরোধের যুদ্ধ।"

এ নিয়ে সে অনেক কিছু ভেবেও রেখেছে। সে বুঝিয়ে দিল, রাশিয়া লালচীন, আর তাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোকে লক্ষ্য করে দু'শোটি টার্গেট থেকে এক সংগে বোমা বর্ষণ করলে কম্যুনিষ্টদের আর যুদ্ধ চালাবার উপায় থাকবে না। এরপর কয়েক হপ্তা সর্বাত্মক যুদ্ধ চালালে কম্যুনিষ্ট সেনা-বাহিনীর অস্তিত্বই লোপ পাবে। এতে অবশ্য কিছু মার্কিণ সেনার জীবন যাবে। কিন্তু আমাদের গজ উলটিয়ে দেবার আগেই দুনিয়া থেকে কম্যুনিষ্ট বিভীষিকা দূর করতে হলে এই আত্মাহুতির প্রয়োজন আছে। এর জন্যে এখনো হয়তো বেশ কিছু দেরী হয়ে গিয়েছে।

বেশ ধীরে সুস্থে পট্সের কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করলাম। ব্যক্তিগত ভাবে সে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। সে শুধু, আমি যা প্রচার করছি, তা পছন্দ করতে পারছিল না। সে স্বতন্ত্র বিপ্লবী মতাদর্শের পোষক। অনেক মার্কিণবাসী এই মতের সমর্থক। কিন্তু আমি তা সমর্থন করি না। এনসাইন তখনো সব কথা শেষ করেনি। সব শেষে সে বলল, "ডক্টর ডুলী, আধুনিক মানুষের জানা সবচেয়ে প্রাচীন চিত্র, পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো শিল্পকর্ম পাওয়া গেছে ফ্রান্সের এক গুহার দেয়ালে। সে ছবিতে আছে

তীর-ধনুক দিয়ে মানুষে মানুষ খুন করে তার চিরাচরিত অবসর উদ্‌যাপনে রত। এটাই চিরকাল বলতে থাকবে। ধর্মার্চনা বুড়ো অথর্ব মেয়ে মানুষের জন্যে।" এ-কথা বলে সে একটু চুপ করে রইল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আসন জেঁকে বসল। সব উগ্রতা উদ্‌গীরণ করে সে যেন একটু শান্ত হল। ঠিক এমনি মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের গাড়ীটা আর নড়ছ না। আমরা তখন টার্মিনালে পৌঁছে গেছি। শোফার আমাদের কথা-বার্তায় নিমগ্ন দেখে কিছু বলছিল না। পটস ও আমি নেমে পড়লাম। আমরা দু'জন দুই মতের পোষক কিন্তু, আমাদের সম্পর্ক এখন বন্ধুত্বের পর্যায়ে। আর এটাই আমাকে হাওয়াইয়ে আমার দ্বিতীয় মহৎ মুহূর্তের সম্মুখীন করে।

টার্মিনালে মৃদু বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাড়ী যাবো এবার। সব কিছু ঠিকঠাক। নিস্তরংগ জীবন যাত্রা। আমেজ-ভরা। খাচ্ছি, দাচ্ছি. আর ঘুমোচ্ছি। সকাল থেকে আবার তারই পুনরাবৃত্তি। কোনো গোলমাল নেই, হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, দুঃখ নেই, নেই কোনো নৃশংস ঘটনার পুনরাভিনয়। ওখানকার বিদেশী ভাষার ঝামেলাও নেই (স্নায়ুর উপর একটু অত্যাচার করে হলেও ভীয়েৎমীন আর ফরাসী আমি বলতে পারতাম)।

হিকহামের টার্মিনাল বিলডিংটা বেশ বড়। আচমকা মধুর একটা আহ্বান কানে এলো। বাড়ী ফেরার ভাবনায় আমি এমনি বিভোর ছিলাম, প্রথম ডাক কানেই এলো না। কিন্তু দ্বিতীয় বারের উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ওয়েটিংরূমেরও মাথার শেষ দিক থেকে কে যেনো ডাকছে: "চাও উং বাক সী মাই" ভীয়েৎমীন ভাষায় যার মানে হোল। "ওহে, মার্কিন ডাক্তার।" আমি ঘুরে দাঁড়াতেই দু'টি যোয়ান বাহুর শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আমার হাত দু'টো আমার দিকেই রয়ে গেলো। আমার কোট জড়িয়ে শক্তভাবে সে আঁকড়ে ধরলো। ছেলেটি ভিয়েৎনাম বিমান-বাহিনীর একজন ক্যাডেট। বেঁটে সুন্দর, বছর ষোলর যুবক। আমার বুকে নিঃশ্বাস ফেলে এতো জোরে জোরে সে কথা বলছিলো যে আমার বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। সহসা সেখানে আরো দু'জন ক্যাডেট এসে হাজির হলো। ওরা আমার করমর্দন করলো, আর এমনি-ভাবে পিঠ চাপড়ে দিলো যেন হাতুড়ী দিয়ে পাকা রাস্তা পিটোচ্ছে। সবার

পরনে ভিয়েৎনামের বিমান বাহিনীর পোষাক। তাদের সবার কথা-বার্তায় জায়গাটা গুলজার হয়ে উঠল।

"আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন না, মার্কিন ডাক্তার? চিনতে পারছেন না?" আমাকে যে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছিলো, সেই ছেলেটি শুধোল। মিথ্যা বললাম— "নিশ্চয়ই। কেন চিনবো না?" এই শত-সহস্রের মধ্যে একখানা মুখ কে মনে রাখতে পারে? কিন্তু দেখুন সেই মিথ্যাটি সত্যে পরিণত হল। আমার হৃদয়ে সেই পুরনো ক্ষত জেগে উঠল। ছেলেটির বাম দিকের কান ছিলো না। যেখানে কান থাকার কথা, সেখানে একটা বিশ্রি কাটা দাগ। সেই দাগটা দেখেছিলাম আমি। তার কর্ণচেছদন করতে হয়েছিলো আমাকে। এই ছেলেটিকে চেনার বিশেষ কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু যে-সব অগুণতি ছেলে-মেয়ের কথা আমি কখনো ভুলতে পারবো না, সে যে তাদেরই একজন। ছিন্ন কর্ণ তাদের পরিচিতির গোপন চিহ্ন।—"তুমি তো বাওলাক থেকে এসেছ, না?" তার আলিংগন পাশ থেকে নিজকে মুক্ত করে বললাম। দলের অন্য সবাইকে লক্ষ্য করে বললাম, 'তুমিও নিশ্চয়ই তাই, না—আর তুমি—হ্যাঁ, তুমিও, কেমন ঠিক না?" তাদের প্রত্যেকের কানের জায়গায় বিরাট কাটা দাগ। আমার মনে পড়লো চীন সীমান্তে রোমান ক্যাথলিক প্রদেশ বাওলাকে কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎমীনরা তাদের এক মাস আংশিকভাবে সাঁড়াশীর মতো এক রকমের চিমটি দিয়ে কেটে নিতো। খারাপ কথায় কান দেওয়ার তাদের এই শাস্তি। সেই খারাপ কথাগুলো হল: "হে স্বর্গস্থ পরম পিতা তোমার নাম জপ করে আমরা পবিত্র হই······আমাদের রোজকার রুটির সংস্থান করে দাও, যা কিছু অমংগল তা থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো····"সত্যিতো, রাষ্ট্রদ্রোহীতা আর কাকে বলে? কম্যুনিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি না চেয়ে খোদার কাছে চা'য় রুটির সংস্থান। নয়া প্রজাতন্ত্রে অমংগল থেকে পরিত্রাণ চাওয়া কতো বড়ো অপরাধ! কান কাটা যাবার পর থেকে যদি শয়তানরা একটু শায়েস্তা হয়!

উনিশ'শো চুয়ান্নর নভেম্বর মাসে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে ছেলেটি পালিয়ে এসেছিলো। সে সব কথা আমায় বলেছে। এরপর আসে আমার ক্যাম্পে। কানের গোড়ার দিকে কিছু কেটে বহির্নালীর উপরকার চর্ম ব্যবচ্ছেদ করে দিলাম। তারপর মাথার খুলির ত্বক আর মুখের ত্বক জোড়া

লাগিয়ে সেলাই করে দিলাম। সেলাইয়ের লাইনে উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া জানতাম দাগটাও বেশ বড় আর বিশ্রি দেখাবে। কিন্তু স্বল্প সময়ে আর নির্দিষ্ট কয়েকটি যন্ত্রপাতি নিয়ে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। ঐ কান তার চিরদিনের জন্যে কালা হয়ে গেল। বাকি কান দিয়ে এখন সে কথা শুনতে পায়। সে পাপের হোক আর পুন্যের হোক! ভিয়েৎনামের যে সব নওযোয়ান এখন হাওয়াইর টার্মিনালে আছে সবাই আমাদের হাইপঙ ক্যাম্প হয়ে এসেছিলো এবং তাদের অনেকেরই এই বিশেষ চিহ্নটি ছিল। আমি তাদের ফরাসী পোত কিংবা সাম্পানে তুলে দিতাম। পরে মার্কিন জাহাজে চড়ে ওরা সাইগনে চলে আসতো। পরে সেখানে যাদের বয়স ষোলর উপর তাদের নবগঠিত ভিয়েৎনাম বিমান বাহিনীতে যোগ দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তাদের মাতৃভূমির অর্ধেক কম্যুনিষ্টদের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে ষোলো বছর বয়সেই ওরা পুরোদস্তর লায়েক হয়ে উঠছিলো। মার্কিন সামরিক সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে তাদের একটি দলকে কারিগরী শিক্ষা দানের জন্যে টেক্সাসে পাঠানো হচ্ছিল। হাওয়াইর বিমান বন্দরে ওরা বছর খানেক আগে তাদের যে মার্কিন ডাক্তার সাহায্য করেছিলো তাকে পরিষ্কার চিনতে পারলো। আর আমি চিনলাম শুধু তাদের দাগগুলো। আমাদের এই অশ্রু সজল কোলাহল-মুখর পুনর্মিলন বেশ একদল কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো। তাদের বেশীর ভাগই মার্কিনবাসী। কয়েকজন জিজ্ঞেস করেই বসল, কী ব্যাপারটা? স্বদেশী বন্ধুদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গেলে একটা ছোটখাট বক্তৃতার প্রয়োজন। তাও ঝাড়া গেল। এই নওজোয়ানদের আগা-গোড়া বীরত্বের গাথা শোনালাম। বল্লাম, আমি কোথেকে আসছি, কী দেখে আসছি। পরিশেষে এইসব এয়ার ক্যাডেটদের কান কাটার কারণ ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে তাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করলাম। আমার মনে হয়, কান্নায় হয়তো আমার বাকরুদ্ধ হয়ে আসছিলো। যারা ততোক্ষণ সকৌতুকে ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করছিলো তাদের চোখেও পানি এলো। এলো আমারও। হিকহামের ডেকে সেই অজস্র অশ্রুধারা অনেক দিনেও শুকোবে না। আমাদের মধ্যে যারা কাঁদছিলো অথচ গোপন করবার চেষ্টা করেনি, সে ছিলো এনসাইন পটস। সেই তরুণ অফিসার, আধঘণ্টা আগে যে আমার দুর্বলতায় উপহাস

করছিলো। আদেশের সুরে বললাম, "মিঃ পটস, নিজেকে সংযত রাখুন, স্যর।"

অশ্রুসিক্ত মুখে সে এগিয়ে এলো।

"দ্যাখো পটস," আমি বললাম, 'একটা আমেরিকান সম্পর্কেও ওদের যে ধারণা, তাতে কি তুমি মনে কোরো না, এই বাচ্চারা তাদের জীবনের বিনিময়ে হলেও একটা কিছু না করে ছাড়বে?"

এনসাইন পটস তার উৎসাহী হৃদয়ের সবটুকু সততা মিশিয়ে জবাব দিলো: "হ্যাঁ, ডাক্তার, তাইতো মনে হচ্ছে। আপনি সম্ভবতঃ ঠিক পথেই চলেছেন। ভালোবাসায় হয়তো কোন বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে।"

ভিয়েৎনামের ক্যাডেটবৃন্দ অনিবার্যভাবেই অসুবিধায় পড়ল। হিকহামে তাদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হল। ফিরে তাকাবারও কেউ নেই। তাদের কেউ ইংরেজি জানতো না। টারমিনালের চারপাশে ঘুরে ফিরে ওরা সময় কাটাতো। বিমান বাহিনীর যে অফিসারটি চার্জে ছিলো, তাকে ডেকে বললাম। সে আমায় বললে, বাচ্চাদের আজই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধোলাম, সে প্লেনে আমার জায়গা হতে পারে কিনা। জানি, সেটা প্রায় অসম্ভব। শুনে আমার নতুন বন্ধু এনসাইন পটস সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল। "স্যার," সে প্রায় গর্জন করে উঠল, "ডক্টর ডুলী এ্যাডমিরাল স্টাম্পে অতিথি। আর এ্যাডমিরালের পক্ষে কথা বলার অধিকার আমার আছে। ডক্টর ডুলী এ্যাডমিরালের ব্যক্তিগত প্লেন ব্যবহার করতে পারেন। মনে হচ্ছে বিমান বাহিনীর কর্তারা আপনাকে সেই উকুন ভর্তি প্লেনেই তুলবেন।"

সত্যি, বিমান বাহিনীর লোকরা আমাকে সেই রাতের প্লেনে জায়গা করে দিয়েছিল। আর সেটা তেমন উকুন ভর্তিও ছিল না। বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর লোকজনে বড়ো কনষ্টিলেশান বিমানখানি ভর্তি হয়ে গেল। বেশ কিছু উপরে উঠলে তাদের আমি আমাদের ছাব্বিশ জন জলপাই রঙের সহযাত্রীর কথা বললাম। এক একজন করে প্রতিটি ক্যাডেটকে ডেকে তাদের কাহিনী বিবৃত করতে বললাম। আমি তর্জমা করে তাদের শোনাতে লাগলাম। আকাশযানে বন্দী শ্রোতারা প্রথমে একটু অন্যমনস্কতা দেখাল পরে সাগ্রহে শুনল। টংকিনের মাউণ্টেইন মিউজিক (পর্বত সংগীত) সুরবৈচিত্র্যে অপূর্ব। হিব্রু স্তোত্রের মতো একটু ভীতিপ্রদ, এই যা। ক্যাডেটরা গাইতে লাগলো, মার্কিন সেনারা মুগ্ধ আবেশে শুনল। এবার এদের পালা। ওদের বললাম, কয়েকটি মার্কিন সঙ্গীত শোনাতে। একজন নাবিক বলল, "ওকে ডক, 'শেক, র‍্যাটল এণ্ড রোল' হলে কেমন হয়? নামটা ভিয়েৎনামীজ ভাষা, তর্জমা করা গেল না। কিন্তু গানটা ভারি মিষ্টি। 'হোম অন দা রেঞ্জ', 'দেয়ারস্ নাথিং লাইক এ ডেম' 'ডিপ

ইন দা হার্ট অব টেকসাস' প্রভৃতি নামগুলোও বেশ জমলো। গান আর অট্টহাসির অনাবিল আনন্দে প্লেনে আমাদের সময় বেশ কেটে গেল। আমরা যখন গোল্ডেন গেটের উপর এলাম, মার্কিনীরা প্রত্যেকেই বিদেশীদের জন্যে তাদের আসন ছেড়ে দিলো। তাদের জানালার পাশে বসিয়ে উত্তেজিত ভাবে হাত পা নেড়ে আকারে ইঙ্গিতে নীচের দৃশ্যগুলো বুঝিয়ে দিতে লাগল। ভারি ভালো লাগছিলো আমাদের। সানফ্রানসিসকোর কাছে ট্র্যাভিস এয়ার ফোর্স বেজে আমরা অবতরণ করলাম। লক্ষ্য করলাম, প্রত্যেক নাবিক, সৈনিক এক একজন ক্যাডেটকে বগলদাবা করে নামছে। এদিকের সবকিছু সেরে টেকসাসে রওনা হতে ভিয়েৎমীনদের দশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হল। বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে একখানা বাস দেয়া হলো। আমাদের কয়েকজন সাভিসম্যান স্বেচ্ছায় তাদের এগিয়ে নিতে সাহায্য করল। আমিও তাদের মনোরম দৃশ্যগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলাম। সানফ্রানসিসকোতে পৌঁছে মনে হল, আমি যেন যুগ যুগান্তর বাইরে কাটিয়ে এলাম। গ্রহণযোগ্য মার্কিন জীবনধারার অনেক কিছুই আমরা বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের কাছ থেকে আমরা মাত্র দেড় কি দু'বছর বাইরে ছিলাম। আর এতেই ওরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল ভীষণ রকম। দেখা হলো তো অমনি শুরু হল, "কী ব্যাপার, ওহে, কেমন, বলো বলো ইত্যাদি।" শুনেছিলাম মার্কিন উদ্ভাবনী শক্তি ইতিমধ্যে এক ধরণের গীয়ারযুক্ত অটো-মোবাইল তৈরী করেছে, যা বোতাম টিপলে স্থানান্তরিত হয়। আর টেলিভিশান সেট করেছে যাতে উল্টে-পাল্টে প্রোগ্রাম বদলানো যায় আর করেছে বাক রোলার টাইপের রশ্যি বন্দুক—যার সাহায্যে অনেক কিছু দেখা যায়। এইসব আশ্চার্য আবিষ্কার আমাকে প্রায় ঘরকুনো করে তুলল। কারণ বাচ্চা ছেলের চোখ নিয়ে আমি এগুলো নাড়া-চাড়া করছিলাম।

সানফ্রানসিসকোর আশ্চর্য বৈচিত্র ভিয়েৎমিনদের চোখ ছানা বড়া করে তুলেছিলো। মিলকাশক কেনবার জন্যে আমরা একটা 'কলনাইট ড্রাগষ্টোরে' ঢুকলে ওরা চারদিক দেখে শুনে এতো অবাক হলো, যেন ওরা পরীর দেশে এসেছে। উজ্জ্বল আলোর নীচে দাঁড়িয়ে তাদের পীড়া পীড়িতে আমি সেলফে রাখা রঙ-বেরঙের বিভিন্ন প্যাকেটের

জিনিষগুলির পরিচয় দিচ্ছিলাম। একটা দল সাবান নিয়ে মাতামাতি শুরু করল। একটা ক্যাডেট গুণে দেখল ওখানে ছত্রিশ জাতের সাবান আছে। "ওদের তফাৎটা বুঝিয়ে দিন না!" ও আবদার ধরলো। ভারি মুশকিলে পড়লাম। এ পর্যন্ত সে এক গোলা সাবানই দেখেছে যা আমি হাইপঙে থাকতে তাকে দিয়েছিলাম। এখন আমার কাছে শুধু একই রকমের সাবান। এখন পর্যন্ত সে জীবনে ঐ একটি বাজে প্রিপারেশানের সাবানই ব্যবহার করছে। তার কাছে ঐ তো একমাত্র আদি ও অকৃত্রিম সা-বা-ন। একজন মার্কিন নাবিক আমায় উদ্ধার করল। বলল, "বলুন না, ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ রকম গন্ধ।" আমি তাই তর্জমা করে ক্যাডেটটিকে খুশি করলাম। সবশেষে আমরা ট্র্যাডিস বিমান বন্দরে ফিরে গেলাম। টেকসাসের অভ্যন্তরে যাবার বিমানে আমার জিনিষ-পত্র তুলে দেবার ব্যবস্থা করলাম।

"বিদায়!"

"বিদায়!" বারবার ওরা একক ও যৌথভাবে আমায় ধন্যবাদ জানাতে লাগল। আমার মনে হলো, আমার কাছেও তাদের ধন্যবাদ পাওনা রইলো একটি কারণে। সেটি হল, ওরা আমায় আমার দেশের কতকগুলো মূল্যবান জিনিষের নতুন করে কদর উপলব্ধি করতে শিখিয়ে দিল। আর তা শুধু জিনিষটির বস্তুমূল্য নয়, হাইপঙে থাকতে দুঃস্থ মোহাজেরদের সাহায্যার্থে মার্কিন ব্যক্তিবিশেষ দলবিশেষ কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এটা সেটা চেয়ে আমাকে নির্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তি করতে হয়েছিল। এখন ছুটির কিছু সময় টুপি হাতে নিয়ে ঘুরে যারা সাহায্য দানে এগিয়ে এসেছিল তাদের ধন্যবাদ জানতে ব্যাগ্র হয়ে পড়েছিলাম। এদের মধ্যে ছিল কতকগুলো ডাক্তারী ঔষধ ও যন্ত্রপাতি তৈরী, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক পরিত্রাণ সমিতি, সর্ব জাতি যুবসঙ্ঘ প্রভৃতি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান। ওয়েষ্ট কোষ্টে থাকতে সানডিয়াগো হাইস্কুল পরিদর্শন করতে মনস্থ করলাম। এর উচ্চতর শ্রেণী থেকে মোহাজেরদের জন্যে কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র পাঠানো হয়েছিল। অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের ব্যবস্থাপনায় সানডিয়াগোর বিভিন্ন স্কুলের মিলিত এক সভায় আমার বক্তৃতাও করতে হল। অসংখ্য কচি মুখের পানে তাকালাম। মনে হল, বাবা আব্রাহামের

চাইতেও বুড়ো আর আচ্ছা দুষ্টু। কেউ পরেছে নীল জীন আর চামড়ার জ্যাকেট। মেয়েদের কেউ পুরো হাতা সোয়েটার! ছেলেদের অনেকের চুল লম্বা, নিচু করে ছাঁটা। ইউনিফর্ম আর রিবন পরে আমি যখন ওখানে হাজির হলাম, ক্ষিপ্তের মত ওরা নেকড়ে চীৎকার আর শিষ দেয়া শুরু করলো। ভারি বেয়াড়া পাল্লায় পড়লাম। তাই কাজের ফিরিস্তি বয়ান করাই ঠিক করলাম। তাদের আমি মোহাজের ক্যাম্পের করুণ কাহিনী, কম্যুনিষ্ট অত্যাচার, স্বাধীনতার পাড়ি, আর ভিয়েৎনামের বিপজ্জনক ভবিষ্যত সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করলাম। একথাটি ধরে বললাম, বুঝতেই পারছেন, বকতে বকতে আমি প্রায় হন্যে হয়ে পড়েছি। কিন্তু ওরা চুপচাপ। সূচ পড়ার শব্দ শোনা যাবে—চারিদিকে এমনি নীরবতা। বক্তৃতা শেষ না হতেই শুরু হল ওদের আন্তরিকতাপূর্ণ সুচতুর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এতোক্ষণ আমায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। উপসংহারের দিকে ভালো করে শোনবার জন্যে পেছন থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে সামনে এসে বসলো। বয়েস তার তেরোর বেশী নয়। গভীর উৎকণ্ঠার সাথে প্রশ্ন করার জন্যে সে তার মুখ থেকে চুইঙ গামের গোলা টুকু ফেলে দিলো। তারপর শুধালো "ডাক্তার ডুলী, আমরা লিংকন মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্যে কী করতে পারি?" এটাই পরিসমাপ্তি আনল। কিন্তু ওগো ছোট্ট মেয়ে, তোমরা চুইঙগাম ফেলে না দিলেও পারতে! তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই। আমি এমন একজন আমেরিকানও দেখিনি যে সব কিছু শোনার পর এ-ধরণের কিছু জিগ্যেস করেনি। কোনো তড়িৎ পরিকল্পনা বাৎলে দেবার উপায় আমার জানা নাই। কোটি ডলারের যে দ্রব্য-সম্ভার বিদেশী সাহায্য বাবত যায় তার আমি কি জানি! কিন্তু আমি জানি, মার্কিন সাহায্য বেশ সতর্কতার সংগে, সহানুভূতার সংগে জনগণের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা হয়। এতে বিদেশীদের সাথে আমাদের অবিচ্ছেদ্য অকৃত্রিম সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মার্কিন ভাইরা, যারা শুধু নেভীতে কেন বিদেশে সমস্ত রকমের কাজ করতে ইচ্ছুক। বিদেশী যদি চায়, তাহলে আমরা ঘরে ফিরে এসেও তাদের জন্যে কাজ করতে পারি।

সহানুভূতি, মহানুভবতা পারস্পরিক বোঝা পাড়ার নিদর্শন স্বরূপ। কেননা এটা মার্কিন জাতীয় চরিত্রেরই বৈশিষ্ট।

ধরা ছোঁয়ার বাইরে এই যে আমাদের অন্তরের আকুতি এশিয়াবাসীদের তা পরিস্কার বোঝাতে না পারলেও আমাদের অজস্র টাকার সাহায্য-দান ব্যর্থ যাবে। এবং তাতে তাদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে আসবে। আমার সামান্য প্রচেষ্টা আর টাকাকড়ি ইন্দোচীনের জনগণের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়নি। যদিও জানি, তাতে ওরা উপকৃত হয়েছিল ঠিকই। সবকিছু করার পর যা ঠিক কাজ দিয়েছিলো তা হল, যখন তাদের বুঝিয়ে দেয়া হল, "ডেলা ডিয়েন ট্রু মাই" (এটাই হল মার্কিন সাহায্য)। দয়া আর মহানুভবতার কথা বলা থেকে আমাদের ক্ষান্ত হওয়া উচিত। যিশু তাঁর মহান আদেশে তিনটি কথায় এসব পরিকার করে দিয়েছেন: "একে অন্যকে ভালোবাস।"

এবার আমি নিজ জেলা সেন্টলুইসে যাবার জন্যে ট্রেনে চাপলাম। আমেরিকার উঁচু নিচু মাঠ-পাহাড় দেখার আমার ভারি সখ। অনেক রাত অবধি আমি জানালায় বসে কাটালাম। তারপর একমনে বাড়ী পৌঁছলাম। আমেরিকায় ফিরে এলাম, না, আমেরিকা ছাড়িওনি কখনো, জানিনে। কিন্তু সে সর্বক্ষণ ছিলো আমার অন্তরের উপলব্ধিতে। তার চিহ্ন আমার মাথার টুপীতে। নৌবাহিনীর নিশানা তেজদৃপ্ত ঈগল শোভা পাচ্ছিল টুপীর সামনে। সেন্টলুই বাড়ীতে থাকবার সময় আমায় হাজার হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হতো। উত্তর থেকে ওরা কীভাবে পালাচ্ছিলো? ওরা দেখতে কেমন? "ডাক্তার ডুলী, তুমিই একমাত্র মার্কিনবাসী যাকে আমার দেশী ভাষায় কথা বলতে দেখলাম। আমার দেশের জনসাধারণ তোমাকে ভালোবাসে। মার্কিনবাসীদের মধ্যে তোমাকেই প্রথম দেখে ওদের অনেকে। তোমাকে দেখে এবং ভালোবেসে ওরা আমেরিকার জনগণকেও বুঝতে পেরেছে" একথা বলতে ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? তাঁর কথা মতো ওরা যদি সত্যি তোমাকে ভালোবেসে থাকে, তবে ওরা তোমায় মেরেছিল কেন? জবাবগুলো দীর্ঘ আর পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। তাহলে আমাকে ওদের বাস্তুত্যাগের সমস্ত কাহিনী—সেই প্রথম দিন একাদশ মাসের শেষের দিনটি পর্যন্ত, বিবৃত করতে হয়।

উনিশশো পঞ্চান্নর কোনো বাসন্তী রাত। উত্তর ভিয়েৎনামের হাইপঙ শহরে গরমে মৃতপ্রায় হয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করছি। আর আরো অনেক মার্কিন যুবকের মতো নিজেকে শুধোচ্ছি: "এই নরকে থেকে আমি করছি কী?" পুরোপুরি পরিতৃপ্তি লাভের উপযুক্ত কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। 'বেম্বো কারটেইনের' দেশে এই যে অমানুষিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছি সেও তো স্বেচ্ছায়। ফি মাসে নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে আমাকে সুযোগ দেয়া হতো একাজ ছেড়ে সুন্দর পরিচ্ছন্ন জাহাজে ফিরে যেতে এবং হয়তো বা বাড়ী ফিরে যেতেও। তবুও প্রতি মাসেই আমি স্বেচ্ছায় এই দুঃস্বপ্নের দেশে বাকি তিরিশ দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। কেন? আমার অবসন্ন মানসিকতায় নিজের বোকামীর জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিলাম। ফেলে আসা পেছনের দিন-গুলোর কথা ভাবতে গেলে মনে পড়ে, জীবনে ডাক্তার হতেই চেয়ে-ছিলাম। এখন, আমার এই আটাশ বছর বয়সে কাঁচা হলেও একজন এম. ডি. ডাক্তার হয়েছি। তাছাড়া নৌ-বাহিনীর ডাক্তার। যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে ১৯৪৪—৪৬ থেকে হাসপাতালে দক্ষতার সাথে কাজ করেছি বলে এটা আমার অতিরিক্ত সম্মান। তাছাড়া, তরুণ হলেও আমি রোগী প্রাপ্তির দিক থেকেও সৌভাগ্যবান। আমার কাঁচা হাতে যতো কেস আসতো অনেক ঝানু ব্যবসায়ীদের কলেজেও অতো জুটতো কিনা সন্দেহ।

ভেজা জবজবে জমির উপর একশো চল্লিশটি তাঁবু। ওগুলোর নাম-করণ করেছিলাম 'ক্যাম্প দালা প্যাগোডা' (মাইল কয়েকের মধ্যে অবশ্য কোনো প্যাগোডা ছিল না)। বারো হাজারের ওপর রুগ্ন, কখনো ভীষণ রকমের বিকলাঙ্গ ভিয়েৎমীনরা এই তাঁবুগুলোতে আস্তানা গেড়েছিল। তাদের বেশীর ভাগই খুব কাঁচা বয়সের নয় তো খুবই বুড়ো। উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্টদের কবল থেকে ওরা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সাইগনের সন্দেহজনক নিশ্চয়তা ওদের লক্ষ্য। বেশ

কয়েক হাজার লোক ইতিমধ্যে আমার ক্যাম্প হয়ে পাড়ি জমিয়েছে। এই মর্মান্তিক বাস্তুত্যাগের পরিসমাপ্তি লাভের পূর্বাবধি তা বাড়তে বাড়তে শত সহস্রে পরিণত হয়েছিল।

দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন সারা বিশ্বের কম্যুনিষ্টদের জন্যে একটা বড় রকমের বিজয়। জানতাম আমি, জাপানের য়ুকোস্কা নেভাল হাসপাতালে থাকাকালীন অন্য খবরের সাথে এটাও আমার কানে আসে। খবরটার গুরুত্ব তখন আমার কাছে নেহাত নগন্য। তাই নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই আমি তাকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি যদি অন্য সবার চাইতে একটু কৌতুহলী হতাম তাহলেই বুঝতে পারতাম, এই পতনের একমাত্র কারণ ইন্দোচীনে ছিলো ফরাসী উপনিবেশ। প্যারীর সারবোনে থেকে আমি পড়া-শুনো করেছিলেম তাই ফরাসীদের সব কিছুর ব্যাপারে আমার একটু আগ্রহ ছিলো। সত্যি, দিয়েন বিয়েন ফুর পতনের ফলেই আজ আমি এখানে এসেছি। কোনো গুণাগুণের মাপকাঠিতে নয়, নেহাত আকস্মিক ভাবেই আমার আগমন। হাইপঙ আর তার সীমানাস্থিত টংকিন বন্দীপে বাস্তুত্যাগের যে হিড়িক পড়ে যায়, তারই চিকিৎসা সম্পর্কীয় ব্যাপারগুলোর চাবি কাঠি আমার হাতে। সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে 'ট্রপিক্যাল মেডিসিন' বিষয়টা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর ঠেকতো। তবু এখানে আমাকে একমাসে এতো ম্যালেরিয়া, ইঅস, বেরি বেরি, বসন্ত, কুষ্ঠ আর কলেরা রোগের চিকিৎসা করতে হয়েছে, অনেক ডাক্তারকে সারা জীবনেও এই ধরনের এতো রোগী ঘাঁটতে হয়নি। আমি ছিলাম একজন নতুন সার্জন। কিন্তু এরি মধ্যে বিভিন্ন রকমের এতো অস্ত্রপচার আমাকে চালাতে হয় যে তার খোঁজ পাঠ্য বইয়ের তালিকায় আমি কোনদিন পাইনি। ছোটো ছেলে-মেয়েদের কানের ভেতরের পর্দায় যদি শলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপনি কী করতে পারেন? কিংবা বুড়ো মেয়েদের গ্রীবার নরম হাড়ে যদি রাইফেলের আঘাত করা হয়, কী করতে পারেন? কাটার রাজত্বের অনুকরণে বুড়ো পুরোহিতদের হাড় অবধি যদি নখ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী চিকিৎসাই আপনি করবেন, বলুন?

ইতিপূর্বে কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্যভার আমার উপর কখনো পড়েনি। কিন্তু এখন বিক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত আর ভীত-সন্ত্রস্ত এক বিপুল জন-সমুদ্রের জন্যে আমাকে আশ্রয়, আহার আর পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

আমার প্রথম কাজ, এই দলগুলোকে পাড়ি দেবার জাহাজে তুলতে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা। নাবিকরা যাতে সংক্রমিত না হয় তাই এই সতর্কতা। কিন্তু যাওয়া-আসার পরও দশ থেকে পনেরো হাজার নিয়মিত অবস্থানকারী-লোকের থাকার আর অন্যান্য ব্যবস্থার বিরাট সমস্যার কিছুতেই সুরাহা হচ্ছিল না। হয়তো শাস্তিই আমার প্রাপ্য। কারণ আমার উপর ন্যস্ত এমন সব বড় বড় কাজও আমি হেলা-ফেলা করতাম না। এই যেমন, মোহাজেরদের পাড়ি দেওয়ার সীমানায় গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসা। জেনেভা চুক্তিতে বলা হয়েছিল, যখন খুশি ওরা বাস্তুত্যাগ করতে পারবে। কিন্তু এখন বোঝা গেল, তাদের মিথ্যে স্তোক বাক্য শোনানো হয়েছিল। আর একটা কাজ আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করছিলাম। মোহাজেরদের কিছু সংখ্যক লোককে অন্তত মার্কিনবাসীদের বুঝতে ও বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেওয়া। মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের তীব্র অপপ্রচারের ফলে যে সন্দেহ, ভীতি ও কিছু ঘৃণাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বেড়াজাল অতিক্রম করে আমাকে এসব করে যেতে হচ্ছিল। এসব কাজে আমাকে ভীষণ আর্থিক অনটনেও ভুগতে হচ্ছিল। মনের ঐকান্তিক সাহস আর ঔদার্য, সর্বোপরি খোদা বিশ্বাসের যাদু আমাকে এসব বাধা-বিপত্তি আর মৃত্যুর সাথে লড়ায়ে রক্ষীর কাজ করেছিল। হ্যাঁ, আমি সেই নওজোয়ান ডুলী, যাকে একদিন অধ্যাপকরা ভবিষ্যতের 'সোসাইটি ডাক্তার' বলে আখ্যা দিয়েছে। আজ এভাবে দিন কাটাচ্ছি, অনুমাষিক কষ্টের মধ্যে এসব আয়ত্ব করছি। নটরডামে আমাকে দর্শন শেখাতে ওদের যথেষ্ট বেগ পেতে হতো। আজ এখানে এই নরক কুণ্ডে বসে আমি মানব প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান-গর্ভ বাস্তব তথ্য আহরণ করছি। আমি জেনেছি যে, সব কারণে নাবিকরা নিষ্ঠুর আর চড়া গলার লোক বলে বিবেচিত হয়, তারই উলটো কারণে রুগ্ন শিশু আর মৃত্যু-পথযাত্রী বুড়ো মানুষের জন্যে কতো দয়ার্দ্র চিত্ত নার্সে পরিণত হয়। সাধারণ দুর্বল চিত্ত মানুষ আর অধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান মানুষের উপর অমানুসিক অত্যাচার চলতে আমি দেখছি। তাইতো বুঝি এমন সুসংগঠিত নিরীশ্বরবাদীতা কেন সাধারণ মানুষের মনের স্বর্গীয় দীপ্তি নেভাতে পারে না। সে রাত্রে

ঘর্মসিক্ত কলেবরে ছোট ডিঙিতে চড়ে বেড়ালাম, সকাল হবার পূর্বাহ্নে তাঁবুতে উঠে আসছিলাম, এমন সময় দাঁড়ি মাঝির মেট নরম্যান বেকারের গলা শুনতে পেলাম। "সব হ্যাম্পশায়ার থেকে, স্যার। এবার আমরা গর্ববোধ করছি" বলতে বলতে সে প্রায় হোঁচট খেয়ে ঢুকে পড়ল। "উঠে পড়ুন, ডক। আরেক ব্যাচ এসে গেছে। আটশো কি হাজারও হতে পারে।" বেকারের কথায় বোঝা গেল নবাগতরা সব পূর্বগতদের মতো। তারা রুগ্ন, অভুক্ত জীর্ন আর খোদা জানেন কতোখানি বিকলাঙ্গ! আমার পা দু'টো একজোড়া কাদামাখা জুতোয় ঢুকিয়ে দিলাম। ফ্লাশ লাইটটা জ্বালাবার জন্যে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আউড়ে যাচ্ছিলাম, "হে আমাদের পিতা! পাপ কাজ থেকে তুমি আমাদেরে রক্ষা কর।" ছেলেবেলা থেকে এ আমার নিত্যকার অভ্যাস। অন্ধকারে একটু থামতে হল। হ্যাঁ, হে খোদা, পাপ থেকে পরিত্রাণ দাও—এই তো জনগণের প্রার্থনা। ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমি যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি আমার ইন্দোচীন বাসের উদ্দেশ্য কি!

উত্তর ভিয়েৎনামে বাস্তুত্যাগের অভিযান সত্যিকার ভাবে শুরু হয়েছিল ফিলিপাইন থেকে। অন্ততঃ আমার জন্যে।

উনিশ শো চুয়ান্নর আগষ্ট মাসের পয়লা হপ্তার কথা বলছি। আমার জামার আস্তিনে দেড়খানা ফিতা সমেত লেফটেনাণ্ট (জুনিয়ার গ্রেড) পদমর্যাদা দিয়ে আমায় পাঠানো হল ইউ. এস, এ, মণ্টেগু এ, কে, এ, (অফিসলিয়ারী কার্গো এ্যাটাক) ৯৮ জাহাজে। এটা অবশ্যি তিরিশ দিনের মেয়াদে। নৌবাহিনীর লোকেরা একে বলে টি, এ, ডি অর্থাৎ টেম্পরারী এ্যাডিশনাল ডিউটি (সাময়িক অতিরিক্ত কার্যভার)। এই তিনটি অক্ষর কিন্তু আমার নামের আদ্যক্ষর—টমাস, এ, ডুলী। জলে স্থলে দু'দিকেই আমাদের রীতিমতো ব্যায়ামে অংশ গ্রহণ করতে হতো। তীরে নামা অভ্যেস করতে হতো ফিলিপাইনের উপকূলে। এমনিভাবে আমরা ঐ এলাকার অরক্ষিত উপকূলভাগ অধিকার করে ফেললাম। (এই কার্যভার এতোই সাময়িক ছিলো যে আমি পূর্ব ষ্টেশন জাপানের য়ুকোসুকায় থাকতে আমার নার্সকে নতুন 'কনভার্টিবল' খানা চালাতে দিয়েছিলাম আর রুমমেটকে বলে এসেছিলাম সে ইচ্ছে করলে আমার আনকোরা নতুন বেসামরিক স্যুটটা ব্যবহার করতে পারে। এগারো মাস পরে জাপানে

যখন ফিরে যাই স্পিডোমিটারে তখনো বিশ হাজার অতিরিক্ত মাইলের ধাক্কা। আর নতুন স্যুটটার কথা বলছেন? ভালো, সেটা আর আমাকে পূরণ করতে হল না। আমার এক শো আশি পাউণ্ডের মধ্যে আট পাউণ্ডই গচ্চা গেল।)

কোন নৌ-বিভাগীয় ডাক্তারের পক্ষে ফাঁক বের করা কষ্টকর কিছু নয়। তীরেও আনন্দ আয়োজনের কমতি ছিল না। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ বাহিনীতেই আমার জীবন কাটাবো। তাই আমি আজ জাহাজ, নাবিক আর তাদের প্রণয়িনী সমুদ্রের মাঝে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। আগে আমি 'দি কুইন এলিজাবেথ,' 'দি কুইন মেরী', 'দি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' প্রভৃতি অনেক যুদ্ধ জাহাজ দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, সেগুলো এই এ, কে, এ-খানার সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। স্বীকার করি, 'দি মণ্টেগু'—'কুইন এলিজাবেথের' মতো বিলাস বহুল নয়। 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের' কক্‌টেল পার্টির জায়গাও এতে নেই। কিন্তু তবু এটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন না এটাই আমার প্রথম জাহাজ আর এখানেই আমি অনেকের সাথে মিতালী পাতাই। নৌবাহিনীতে মিতালি পাতানো খুবই সোজা। কিন্তু ভুলে যাওয়া খুবই কঠিন।

কয়েক হপ্তা ধরে তীরে খুব হৈ-চৈ করলাম। তারপর জিনিস-পত্র সব তুলে নিয়ে ম্যানিলা দ্বীপ অতিক্রম করে সিউবিক উপসাগরে উপনীত হলাম। সেখানে আমাদের প্রায় সবাই 'ক্লাব টাইম' ব্যায়াম শুরু করে দিল। সাঁতার কাটা, রোদ পোহানো, ঘুমানো কিংবা জিন আর টনিক সেবন—সেজন্যে ফিলিপাইনের অসহ্য গরম থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নব্বুই নম্বর টাস্ক ফোর্সের ওপর বারোই আগষ্টের (১৯৫৪) মধ্যে হাইপঙের পথে অগ্রসর হতে আদেশ জারী হল। সেখানে নোঙর গেড়ে পরবর্তী আদেশের জন্যে অপেক্ষা করতে বলা হল। স্বাধীনতার পাড়ি' চলছিল ওপথেই। আমরাও তার অংশ বিশেষ। তাই কারো সাথে সে-সব ব্যাপারে আলোচনা অবিধেয়। শেষ আদেশটি পালন করা খুবই সহজ সাধ্য। ইন্দোচীন যে চীনের দক্ষিণে এবং ভারতের পূর্ব দিকে অবস্থিত এছাড়া আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই সে দেশ সম্পর্ক

বিশেষ কিছু জানতো। এই 'স্বাধীনতার পাড়ি' আমাদের ধারণা আরো ঝাপসা। কী বা কারা, কোথায় এবং কেন স্বাধীনতার পথে পাড়ি জমাচ্ছে, বোঝা গেল না। থাক, হাইপঙ পৌঁছে নোঙর না করা অবধি আমাদের উপর কোনো বিস্তৃত আদেশ এসে পৌঁছানোর কথা নয়। মণ্টেগু জাহাজে টাস্কফোর্টের ভারপ্রাপ্ত এডমিরাল এসম্পর্কে কিছু জানতেন। তবে তাও আমরা ফিলিপাইন ত্যাগ করার আগে, আদেশ নামা মুসাবিদা করার আগে নয়।

আমরা অবশ্যি জানতাম যে আমাদের জাহাজে দু'হাজার লোক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দু'দিনের মধ্যে সে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যাত্রা শুরু করবার আদেশ এলো। তাই যাত্রা করতে আরও দু'দিন সময় নিল। মোট চারদিনে আমাদের ট্যাঙ্ক আর ট্রাকবাহী মণ্টেগু জাহাজকে মানুষবাহী জাহাজে পরিণত করতে হল। এবং তাও এক সঙ্গে দু'হাজার মানুষ।

জাহাজের মেডিকেল অফিসার হিসেবে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম কক্সের মুখের বিপর্যস্ত অবস্থা লক্ষ্য করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমি ছিলাম উৎসাহ-উদ্দিপনাপূর্ণ শিক্ষা নবীশ। তাই কাজ ছেড়ে এসব হৈ-চৈ-পূর্ণ তদ্বি-তল্পা আমার কাছে তামাশার মতো মনে হল। দু'দিন সিউবিক উপসাগরে আর দু'দিন স্বাধীনতা পাড়িতে আমাদের অবিশ্বাস্য রকম অসুবিধার মধ্যে কেটেছে। এই জাহাজটিকে আমরা একটা যাত্রীবাহী জাহাজে পরিণত করেছিলাম অথচ তার উপযোগী বিলাস সামগ্রী কিছুই এতে ছিল না।

একটি এ, কে, এ, জাহাজ লম্বায় ৪৬০ ফুট। পাঁচটি বড়ো কামরা আর একটির সামনে তিনটি খালি জায়গা। এখানে ট্রাক, ট্যাঙ্ক এবং উভচর যানবাহনাদি রাখা হতো। কামরাগুলোতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। প্রবেশ দ্বারে যে ঢাকনা ছিল, মাল ভর্তির পর তা বন্ধ করে দিতে হতো। ওগুলোর উপরে রয়েছে তীরে নামবার যানবাহন। সাধারণতঃ এই কামরাগুলোর পুরো মাল ভর্তি হলে ঢাকনাটা বন্ধ করে সামনের খালি জায়গাতে মাল রাখতে হতো। এই স্বাধীনতার পাড়িতে এগুলো মালের পরিবর্তে মানুষ—আবাল বৃদ্ধ বনিতায় ভরে ওঠে। জাহাজের নক্সা যাঁরা করেছেন তাঁদের কল্পনায় হয়তো এদৃশ্য অচিন্ত্যনীয়

ছিলো। ভারি চমৎকার—ব্যবস্থা যাহোক! প্রথমে আমরা করলাম কি, ডেক-সমান্তরাল থেকে সমস্ত সিঁড়িগুলো সরিয়ে কামরার সামনে দিলাম, ওরা এসে যাতে স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করতে পারে। ধাতু-নির্মিত ঢাকনাটা বদলে কাঠের দরজা বসিয়ে দেওয়া হল। কামরার ভিতর পানি আর পাখার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। তাছাড়া সাধ্যমত আরো কিছু টুকি-টাকি দরকারি জিনিষ-পত্র দিতে কসুর করলাম না। ঢুকবার ঢাকনাগুলো অবশ্য খোলা রাখা গেল না। তাহলে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ওরা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে। তবে অন্যান্য ঢাকনাগুলো সরিয়ে রেখে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেক ডিবিশান অফিসার বুঝে নিলেন, তাঁদের কী কী জিনিস প্রয়োজন। তারপর সবাই মিলে চলে গেলাম সিউবিক উপসাগরের সাপ্লাই ডিপোয়। বিধি-নিষেধ আর ভদ্রতার বালাই ছেড়ে দিয়ে যা কিছু দরকার, সব নিয়ে এলাম। বেশ কিছু টন চা'ল, কয়েক শো ঝুড়ি সামুদ্রিক মাছ, হাজার খানেক পান-পাত্র, ঘাট গ্যালনের ড্রাম, পোর্টেবল পায়খানার জন্যে খালি রঙের বাক্স, সমুদ্র পীড়াগ্রস্থের জন্যে 'স-ডাষ্ট'—সব নিয়ে আসা হল।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা সিউবিক উপসাগরের বাইরে পাড়ি দিলাম। সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট চাল। চলছে রহস্যালাপ আর স্কাটলবাট। প্রত্যেক নাবিক, প্রতিটি অফিসার একবার ভিতরের দিকে চলে যায়। ব্যবস্থাপনা দেখে-শুনে অন্য কারু সাথে মিশে উপভোগ করে। বাইরে এসে আর কাউকে বলে না। ওয়াউরুমে অফিসারদের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক হয়। তলিকাভুক্ত ব্যক্তিরা এসে আলোচনায় যোগ দেন। তারপর সবার মিলিত সভা হতো। সেখানে সবাই আপন আপন সূত্র থেকে খবরাদি সরবরাহ করতো। এতে আর কিছু হোক না হোক, একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠতো, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে আমরা কতো অজ্ঞ! যতো রেফারেন্স বই পাওয়া গেল, পড়তে সবাই উঠে পড়ে লাগলাম। পুরনো ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। চারদিকে শুধু ইন্দোচীন সম্পর্কে কিছু শুনবার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বেড়ালাম। খোঁজাখুঁজিই সার হল, জানা গেল নিতান্ত নগন্য।

সহসা সমুদ্রে কিসের চীৎকার শোনা গেল। আদেশের সুর প্রতিধ্বনিত হল আমাদের জাহাজে। আমাদের হবু অতিথিদের সুযোগ সুবিধার

জন্যে ব্যবস্থাপনা চলছে। খাবার পানির জন্যে ষাট গ্যালন ক্যানভাস লিষ্টারের ব্যাগ কামরার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হলো। অয়েল ড্রামগুলো পরিষ্কার করে ধোওয়া মোছার জন্যে পানি ভর্তি করা হলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন কক্সের কাজের চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে পায়খানার ব্যবস্থা। তেলের ড্রামগুলোকে লম্বা করে রেখে, উপরে গর্ত করে ছুতার-মিস্ত্রি দিয়ে সেখানে কাঠের পা-দানি করিয়ে দিলেন। এপর্যায় শেষ হবার পর স্কিপারের দ্বারা তা পরীক্ষা করালেন। জানিনে, এসব ব্যবস্থা তিনি কার জন্যে করছেন—ভিয়েৎমিনদের জন্যে না জাহাজে ডাক্তারের জন্যে। কিন্তু তাঁকে এবার দেখা গেল সিরিশ কাগজ আনতে আদেশ দিতে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সীটগুলো ঘষিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিলেন। সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে তিনি নাবিকদেরকে প্রয়োজন মতো ওগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে গেলেন। এসিয়া-বাসীদের পায়খানা করবার পদ্ধতি যে আমাদের চাইতে ভিন্ন তা জানতে বাকী ছিল আমাদের।

এমনি করে আমাদের সব অসুবিধার পরিসমাপ্তি ঘটল। এখন আমরা প্রস্তুত। কিন্তু কী জন্যে?

একটু পরেই তা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম, যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর নেতৃত্বে যে সর্ব বৃহৎ হস্তত্যাগের অভিযান শুরু হয় আমরা তার অগ্রগামী রক্ষী বাহিনী।

উনিশ শ চুয়ান্নর চৌদ্দই আগষ্ট।

মণ্টেগু জাহাজকে বৈদ্য এলভের সুররিয়ালিষ্ট সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত দেখাচ্ছিল। সমুদ্র তীরে নোঙর করেছিলো আরো কয়খানা জাহাজ। শনেরো তারিখের ভিতর সারি বেঁধে দাঁড়াল আরো পাঁচখানা। আমরা ছিলাম এক নম্বর সারিতে। মালবাহী আরেকখানা জাহাজ মেনার্ড ছিলো পাঁচ নম্বরে। মোহাজেরদের দেখবার জন্যে আমরা উৎকণ্ঠচিত্তে অপেক্ষা করছিলাম। তাদের দেখতে কেমন? সংখ্যায় ওরা কতো হতে পারে? আর কী কী রোগ নিয়ে আসছে সঙ্গে? দেখব তা শীগগিরই। ভাবতে চেষ্টা করলাম, এই যে অসংখ্য লোক চার ঘণ্টা ধরে নদীতে কাটিয়ে হাইপঙ শহরে ঢুকবে, তাদের অবস্থাখানা কি দাঁড়াবে! তখনো আমি বুঝতে পারিনি তীরের ওপারে আমায় এমন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, আমার স্মৃতিপটে যা সারাজীবন একটা দাগ কেটে যাবে।

সহসা একটা ডাক শুনলাম। দেখলাম ক্রুদ্ধ ঢেউ পেরিয়ে ওই যে ছোট্ট 'এলসিটি'খানা আসছে ওদিক নির্দেশ করে কে যেন চীৎকার করে উঠল। এই ক্ষুদ্র পোতগুলো চার পাঁচটি ট্যাঙ্ক আর কিছু লোকজন পারাপার করবার জন্যে তৈরী হয়। তাদের পূর্ণ দৈর্ঘ একশো পঞ্চাশ ফুটেরও কম। ওটি কাছে আসতে, আমি ভয়ে ভয়ে নীচে তাকালাম। জানি, ভয় শব্দটা এখানে একটু কড়া শোনাবে। কিন্তু উপায় নেই। ওখানে ডেকের ওপর এক হাজারের ওপর লোক খাঁচায় পোরা মুর্গীর মতো জমা হয়ে আছে। কড়া রোদে ওদের সবাইকে ভেজা আর সমুদ্র-রোগগ্রস্থ বলে মনে হচ্ছিল। সবার মুখে ভীতির ছায়া। তাদের ভিতর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে রয়েছে অসংখ্য। 'এলসিটি' খানা জাহাজের সঙ্গে ভীড়লে বেশ বড় খোলা একটা সিঁড়ি তার ডেকের ওপর রাখা হল। সমুদ্রে তখন উত্তাল তরঙ্গরাশি। তবু যতোখানি সম্ভব শক্ত করে রাখা হল। মোহাজেরদের বলা হল এবার উপরে

উঠে আসতে। ভয়ে ওরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমি মনে করলাম এটা তাদের অজানা অচেনার ভয়। পরে জানলাম তাদের ভীতির কারণ আরও স্পষ্ট বন্য, অমানুষ মার্কিনীদের ভীতি। আমাদের সম্পর্কে ওদের অনেক রকমভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে বেশ বুড়ো এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। অতিকষ্টে তিনি উপরে উঠে এলেন। মাথায় তাঁর ছুঁচলো খড়ের টুপি, একহাতে শক্ত করে ধরা বাঁশের পাইপ, অন্যহাতে আরো শক্ত করে ধরা রয়েছে স্বর্গীয় কুমারী মাতা মেরীর ছবি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, এগুলোই তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। হয়তো এছাড়া ধন-সম্পদ বলতে তাঁর আর কিছু ছিলও না। বীরদর্পে কয়েক পা এগিয়ে এসে নীচে সমুদ্র গর্জনের দিকে তাকালেন তিনি। ব্যাস, একবার তাকানোই যথেষ্ট। যেখানে ছিলেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। উপরের দিকে যখন তাকালেন, তখন তাঁর ফ্যাকাশে মুখে অনেক কিছুর ছায়াপাত ঘটলো। সবচেয়ে সুস্পষ্ট অনশনের স্বাক্ষর। তারপর নীচের সমুদ্র গর্জনের ভীতি—উপরে তার চেয়ে বড়ো ভীতি—অনিশ্চয়তার ভীতি। এতো কুঁজো হয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, মনে হয়ে বুঝি তাঁর ঘাড়ে খুব ভারী বোঝা চাপানো হয়েছে। একটু কেঁপে মাথার হেঁটটা সরালে দেখা গেল, বেশ বড়-সড় কয়েকটা ক্ষত। ঝিকমিকে রোদের আলোয় চামড়ায় যখন টান পড়লো, বুকের পাঁজরগুলো আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। এমন হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্য আর দেখিনি। এই কি ভিয়েৎনাম? সাদা টুপি-পরা একজন নাবিক এগিয়ে গেল। সে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলো। কিন্তু বুড়োটার অনিচ্ছা দেখে থমকে দাঁড়াল। যখন সে তাকে স্পর্শ করছিলো মনে হলো দাদু যেন জল্লাদের হাতে নিজেকে সমর্পন করেছেন। তবু পেছনের লোকগুলোর ধাক্কাই তাঁকে ডেকের উপর নিয়ে আসতে বাধ্য করলো। একজন নাবিক তাঁকে নম্বর লেখা কার্ডখানা দিল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি তা নিলেন। তাকে সিঁড়িপথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে খুব অনুরোধ করা হল। আরো কয়েকজন মোহাজের উঠে আসলে পথটা আমরা বন্ধ করে দিলাম। সিঁড়ির উপর একটা ক্যানভাস চাপিয়ে দেয়া হল যাতে নীচে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ দেখা না যায়। মনে হলো এতে ওদের ভীতি কিছু কমল। তবু দেখা গেল অন্যান্য দুঃস্বরাও

বেশ সভয়ে উঠে আসছে। তাদের অনেকের সাথে রয়েছে লম্বা থলে। তার ভিতর পুরে এনেছিলো গোটা জগৎসংসার। সবাই কিছু কাপড় চোপড়, বাসন-কোশন আর চপষ্টিক (চীনাদের খাবার কাঠি) সঙ্গে করে এনেছিলো। তাছাড়া সবার কাছে কিছু না কিছু ধর্মীয় জিনিস —একটি ক্রুশ, মূর্তি বা কোন পবিত্র ছবি অবশ্যিই ছিলো।

সেই ক্যানভাস ঢাকা সিঁড়িপথে ওরা এগিয়ে আসছিলো। কারু কারু চোখ নীচু—মনে হয় যেন আমাদের পানে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। তাদের পিঠে কোলে অগুণতি কাচ্চা বাচ্চা। একটু বয়সী ছেলেরা দু' একটা শিশু কোলে করে নিয়ে আসছে। বাচ্চাদের জন্যে দুধের টাগ-দেয়া হলো। এই বিলাস দ্রব্যের সাথে ওরা অপরিচিত। ছোট শিশুরা ভারি মিষ্টি। চোখগুলো ড্যাবড্যাবে। তবে কেমন যেন মলিন। ভীত চকিত ওরা সবাই। একটা নাবিককে দেখলাম মায়ের বোঝা হালকা করবে বলে তার শিশুকে কোলে তুলে নিল আর বিড়-বিড় করে বলল, "ও আল্লা, মুখে কী বিশ্রি গন্ধ!"

এমনিভাবে মোহাজেরদের উপরে তুলে নেয়া হলে ফরাসী এল, সি, টি, খানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আরেকখানা এল। চলল একই বিরক্তিকর যাত্রী বদলানো। এইসব গোলমালের ভিতর জানি না কী করে আমাদের মেহমানরা বেশ বড় একটা দুর্গন্ধময় তেলের পিপা ও উপরে উঠিয়ে নিয়েছে। একবার গন্ধটা শুঁকে আমি ওটাকে বাইরে ফেলে দিতে আদেশ দিলাম। পরে জেনেছিলাম, পূতিগন্ধময় তেল টংকিনবাসীদের রান্নাবান্নার জন্যে অপরিহার্য।

এখন দু'হাজারের উপর টংকিনবাসী 'স্বাধীনতার পথে পাড়ি' দিতে প্রস্তুত হয়েছে। ওদের দেশ 'বেম্বো কারটেইনে' পরিণত হবার পর এই প্রথম দল বাস্তুত্যাগ করছে। শতাব্দীর পুরনো জনপদ, পূর্ব পুরুষের কবর সব ফেলে স্বেচ্ছায় ওরা চলেছে অন্য দেশে। তাদের প্রতি দশ জনের ন'জন চলেছে আজ তাদের ঘর-বাড়ী, ধান-চাল, প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে শুধু একটি আশা পূরণের জন্যে—তাদের স্রষ্টাকে প্রণতি জানাবার দাবী অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে। টংকিন উপকূলে অধিবাসীদের জন্যে দক্ষিণ দেশ তো প্রায় বিদেশ। সেখানে তাদের ভাগ্যে কি আছে, কে জানে! আর এই বড়ো নাকওয়ালা বাহারে পোষাক-পরা সাদা চামড়ার দল তাদের ঠিক-ঠিক

দক্ষিণ দেশে নিয়ে যাবে ত? হো চি মীনের চেলারা ওদের অনেক কথা অনেক রকমে বুঝিয়েছে। মার্কিনীদের কাছে মনুষ্যত্বের আশা করা যে বাতুলতা তাও বোঝাতে বাকি রাখে নি। হ্যাঁ, সেই বহুশ্রুত হো চি মীনের কথাই আমি বলছিলাম। মস্কোর সাথে যাঁর নাড়ীর যোগ। এদের অনেকে কিন্তু তাঁকে এখনো জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক বলে মনে করে। তাদের বলা হয়েছে, এই বাস্তুত্যাগের ব্যাপারটা আসলে একটা ফাঁদ। মার্কিন নাবিকরা বুড়ো লোকদের সমুদ্রে ফেলে দেবে। বাচ্চাদের হাত কেটে ফেলবে আর সুশ্রী মেয়েদের চিক্রি করে দেবে ধনিক সম্প্রদায়ের কাছে। তাদের উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। ওরা অনেক প্রচার লিপির ছবি দেখেছে, যাতে সাদা টুপি-পরা নাবিকরা একটি 'জীবন্ত শিশুকে রোষ্ট করে খাচ্ছে (হয়তো ব্রেকফাষ্ট করছে)। ছবিগুলো নেহাৎ বাজে কিন্তু স্পষ্ট। তাই জাহাজে নবাগত অসংখ্য লোকের মধ্যে একটির মুখেও হাসি নেই। ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই কয়েক ঘণ্টার ভিতর যখন প্রথমে ছোটদের পরে বড়োদের মুখে একটু একটু লাজুক হাসি ফুটে উঠছিল তখন আমাদেব দস্তুর মতো অবাক হবার পালা। আমাদের মেহমানদের মানসিক প্রশান্তি তখন ফিরে আসছিল।

পাকঘরে খবর পাঠানো হল। তাদের সামনে এবার বিরাট দায়িত্ব। হাজার কয়েক লোকের খাওয়া বাকি। একটু পরিষ্কার আর মজবুত ক'জন ভিয়েৎমীনদের খাবার সরবরাহে সাহায্য করবার জন্যে বাছাই করে নিলাম। এই টুকু বাছাই করতেও আমাদের বেশ বেগ পেতে হল। আমরা ঠিক করলাম দিনে দু'বার খাবার দেয়া হবে। তাদের স্বাস্থ্যে ভিটামিনের অভাব প্রত্যক্ষ। এভাবে পেটপুরে খাবার সৌভাগ্য সম্ভবত অনেকদিন ওরা পায়নি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের আবার একটু নাজুক অবস্থায় পড়তে হল। লক্ষ্য করলাম, মোহাজেররা আমাদের রান্নাকরা ভাত পছন্দ করল না। পাক হয়েছিল আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে। চমৎকারভাবে দোলা-দোলা রেখে। পরে ওগুলোকে বেশ শুকনো করে রাঁধা হলে ওরা ভারি খুশি হলো। দু'টো বেশীও খেলো।

মোহাজেররা সবাই উপরে উঠে আসার পর সিঁড়িখানা তুলে রাখা হলো। স্কিপারকে ভিতরে খাবার প্রস্তুতি সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো দেয়া হলো। নীল সবুজ পানি অতিক্রম করে এই নতুন ধরণের বোঝা নিয়ে

আমাদের মণ্টেগু জাহাজ দক্ষিণাভিমুখী এগিয়ে চলল। একটু পর আমরা অসহ্য গরম বোধ করলাম। পূতিগন্ধময় আবহাওয়া একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠল। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রত্যেকটি খুপরীতে বেশ বড় বড় 'মধুভাণ্ড' ছিল আর ডেকে বেশ বড় কয়েকখানা পায়খানাও ছিল। কিন্তু মোহাজেররা সেগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি জানতো না, তাই যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করে বেড়াল। ক্যাপ্টেন কক্স খানিক পর আমায় ডেকে পাঠালেন। বিষাদ-ভরা কণ্ঠে বল্লেন। "দেখ ডুলী, আমার পায়খানাগুলোর অবস্থা দেখ।" দেখলাম। দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। ওখানে সাত আটজন মোহাজের নিতম্ব ঢুকিয়ে না বসে পায়ের গোড়ালির ওপর বসে মল ত্যাগ করছে। ওদের পদ্ধতিই ওরকম। আমরা তার কিছুই করতে পারিনে। কয়েকজন ফরাসী-ভাষী পুরোহিত আর বয়স্ক লোকের (যাদের মান্দারিণ বলা হতো) সাহায্যে আমরা জাহাজের নিয়ম-কানুন শেখাবার চেষ্টা করলাম। এটা খাবার পানি, ওটা বাজে খর্চার পানি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব তাদের চলে বেড়াবার সময় অতি কষ্টে আমি জমি দখল করে ছিলাম। ওরা ছিলো বড্ড নোংরা। অনেকের আবার ঘা, চুলকানি প্রভতি পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভালো চিকিৎসার অভাবে অনেকের তা বিকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেণ্ট লুইসে উষ্ণিক্যাল মেডিসিনের উপর যে পড়া-শুনো করেছিলাম তার ক্ষীয়মান স্মৃতি থেকে রোগের উপসর্গ বুঝতে দেরী হলো না। এতে আরো একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল, এদের জন্যে আমাদের আরো অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হবে।

নাবিকদের বলে দেয়া হয়েছিল, ওরা যেন মোহাজেরদের সাথে বেশী মেলামেশা না করে। কারণ ওরা নানা সংক্রামক রোগের বীজানু বহন করে আনছিল। কিন্তু নীল জ্যাকেট-পরা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে আবেগ ও দয়ার আতিশয্যে সব ঠাণ্ডা নীতিবাক্য ওদের কানের বাইরে চলে যেতো। ভিয়েৎমীনদের সাহচর্যে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসতো। নানাভাবে ওরা ওদের উদ্বেগ ব্যাকুল মন শান্ত করবার প্রয়াস পেতো। ব্যথা জর্জর শরীরের ব্যথা উপসমের চেষ্টা করতো। আমি প্রায় সারাক্ষণ রোগী পত্তর দেখা শুরু করলাম। আমায় সাহায্য করছিলো কয়েকজন মেডিক্যাল ফোরম্যান, শক্তি সমর্থ পাইপ ফিটার, বয়লার টেণ্ডার আর মেশিন বালক। রোগ টোগের ব্যাপারে ওরা জানতো শুধু সামান্য

উপদেশের পরই দেখি ওরা অভিজ্ঞ লোকের মত কাজ করতে শুরু করল। প্রায় ঠিক ঠিক পিল খুঁজে দেয়া মলম লাগানো প্রভৃতি কাজ যথাযথ করে যাচ্ছিল। তাদের কাজে অনভিজ্ঞ ছিলো না। তাই বলে আন্তরিক সহানুভূতির ছাপও কম ছিলো না। ছেলেদের দুধ বিলি করবার জন্যে ক'জন পাহলোয়ান গোছের নাবিক নিযুক্ত করা গেল। এই দুধওয়ালা বা (এই বলেই ওদের আমরা ডাকতাম) যখন দুধ বিলি করতে বেরুতো, ছেলে-পুলের দল তখন ওদের ঘিরে দাঁড়াতো। নবজাতক শিশুদের জন্যে বোতল দরকার। কী আশ্চর্য, গোপনে লুকিয়ে রাখা বীয়ার বোতলগুলোয় রবারের বাঁট লাগিয়ে নিয়ে আসা হলো। ইঞ্জিনিয়ারের কামরায় আগুন নেবানোর যে রবারের নল আছে সেগুলো কেটে বাঁট তৈরী করা হচ্ছিল। যেসব ছেলে-মেয়েরা কাগজের কাপ থেকে খেতে পারছিল না, ওরা তাদের খাইয়ে দিচ্ছিল। আমার সহকারী একজন এসে খবর দিল, পাঁচ নম্বর রুমে ছেলে একটির ভীষণ ডায়রিয়া। শ্বাস তুলছে, আমার মনে তখুনি শংসয় জাগল। চুপি চুপি বলি, এ নিশ্চই ক-লে-রা। কিন্তু তাতে সন্দেহমুক্ত হবার আগেই বাচচাটি পরপারে যাত্রা করেছে। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা অবিলম্বে সমুদ্রে তার সৎকার করতে চাইলাম। আর তা নিয়ে প্রায় দাঙ্গা বাধবার উপক্রম হল। ছেলেটির আত্মীয় স্বজন ও সেই সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাইল। বেশ ক'জন শক্ত সমর্থ নাবিক ওদের ধরে রাখল। অনেক কষ্টে তাদের একটু চা খাওয়ালাম। আর তাতে সবাই ডেকের ওপর শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। বলাবাহুল্য, চায়ের সঙ্গে কিছু ক্লোরাল হাইড্রেট মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

নাবিকদের একটা দলের সঙ্গে মোহাজেরদের ঘিচি-মিচি লেগে গিয়েছিল। কারণ ওরা তাদের মধুভাণ্ড উপরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। ফেলে দেবে বাইরে। ওদেরও একটা করে বেসরকারী পদবী ছিলো। অবশ্য তা যেন সবের স্বীকৃতি পায়নি। এখানে এমন কতকগুলো রোগের চিকিৎসা আমায় শুরু করতে হলো ইতিপূর্বে যার নামই শুনেছি শুধু। প্রথম দিনই দশটা বসন্ত রোগীকে ভিন্ন করে রাখলাম। ইঅ, কুষ্ঠ, এলিফেনটিয়াসিন, গনরিয়া আর যথেষ্ট ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত লোক দেখলাম।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে অভিযোগ করবার অধিকার একটা অকাট সত্য। সবাই দৃঢ়ভাবে এই ঐতিহ্য মেনে চলে। কিন্তু মণ্টেণ্ড জাহাজের

'ক্রু'দের কাছ থেকে খুব কম অভিযোগই আসতে লাগলো। অথচ দুর্গন্ধময় ময়লা সাফ করা, পানীয় জলের অভাব, ডেকে নানা রকমের অসুবিধা, অতিরিক্ত পাহারা দেয়া প্রভৃতি তাদের অনেক কাজ বেড়ে যাওয়া সত্বেও ওরা অপরিসীম ধৈর্যে সব সয়ে যাচ্ছে।

রাত্রিতে ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে খুপরীর ডেকগুলো নষ্ট না করে সেজন্যে পাহারাদাররা ওদের উপরের পায়খানায় নিয়ে আসতো। সহজে আসতে চাইতো না বলে তাদের ফ্লাশ লাইট বয়ে নিয়ে আসতে দেয়া হতো। এতে ছেলে-মেয়েরা ভারি মজা পেতো। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, অনেক সময় ওরা এর লোভে বিনা প্রয়োজনেও আসতে চাইতো।

লোয়ার ডক লেভেলের কিছুটা জায়গা জুড়ে 'ক্রু'রা ঘুমোবার জায়গা করে নিয়েছিল। মোহাজেরদের এখান থেকে দূরে থাকবার কথা। কিন্তু সেখানকার বিশেষ একটা কামরা ওদের ভারি পছন্দ হয়ে গেল। তাই ওরা ওখানে ঢেরা না পেতে পারল না। যে মজার রুমটি ওরা বেছে নিয়েছিল সেখানে ছিল বড় বড় চীনামাটির সোরাই আর বেসিন ইত্যাদি। লম্বা পরিষ্কার পাইপে সেখানে সারাদিন পানি মিলতো। (অবশ্য নাবিকদের কেউ কেউ ওখানে হাতমুখ ধোওয়ার জন্যে কখনো কখনো যেতো। তাই ওরা ওগুলো ব্যবহার করবার ভরসা পেতো না।) তবু এই সুবিধাজনক ব্যবস্থায় বেপরোয়া মায়েরা তাদের ছেলে-পুলে নাইয়ে নিতে ছাড়তো না। বোধকরি মিনাল ইউরিনাল কম্পোনীকে নৌবাহিনীর জাহাজে এমন চমৎকার বেবী বাথটাব বসবার জন্যে প্রশংসাপত্র লিখে দেয়া উচিত হবে। ভিয়েৎমীনদের আমরা বেসিন ব্যবহারের কায়দা কানুন শিখিয়ে দিলাম। আরও একটি মার্কিন রীতির সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সে হল, সৌন্দর্য প্রতিযোগীতা। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় একটা সৌন্দর্য প্রতিযোগীতা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়দর্শন একজনকে বাছাই করে তাকে 'মিস প্যাসেজ টু ফ্রিডম' উপাধি দেয়া হলো। স্বয়ং ক্যাপ্টেন তাকে নির্বাচিত করেছিলেন। তার পরনে ছিল সিকবেড থেকে নেয়া একটি নাবিকাল পোষাক আর মাথায় ছিল ছেলেদের খেলনার মুকুট। তাকে বসানো হলো সাধারণ জুতার মিস্ত্রির দোকানে তৈরী সিংহাসনে। বাবুর্চিরা তার জন্যে ফলমূলের অতিরিক্ত রেশন বরাদ্দ করল। বোঝা গেল,

এসবে সে খুব মজা পাচ্ছে। তার পানখেকো কালো দাঁত দিয়ে মৃদু হেসে সে আমাদের খুশি করলো।

প্রত্যেক জাহাজে থাকতো একজন ফরাসী লিয়াজোঁ অফিসার আর একটা 'কণ্ট্রোল টীম'। এরা ভিয়েৎমীন থেকে কেন্দ্রে আর কখনো বা ইংরেজীতে তর্জমা করতে। জাহাজের এধার ওধার ঘুরে বেড়ানো ওদের কাজ। আমরা তাদের ক্রুদের শামিল গণ্য করতাম। লাউড স্পীকার মারফত ওরা বিদঘুটে মার্কিন রীতিনীতিগুলো মোহাজেরদের বুঝিয়ে দিতো : "মূত্রাধার কেবল প্রস্রাব করবার জন্যে। পায়খানা শুধু পায়খানা করার জন্যে। আর দ্যাখো, ভয় করো না নাবিকরা কক্ষণো তোমাদের ছেলে-মেয়েদের জীবন্ত ধরে খাবে না।

মোহাজেররা কম্যুনিষ্ট প্রচারপত্রে একটা ছবি দেখেছিল প্রায় আমার মতোই একজন নেভী ডাক্তার জনসাধারণকে বিষাক্ত জীবাণু দিয়ে টীকা দিচ্ছে। আমার মনে হয়, এর পুরস্কারও ওরা পেয়ে গিয়েছিল। কারণ সমুদ্রের দিকে আগত যাত্রীবাহী একখানা এল সিটি (উভচর যান) ওদের হঠাৎ ভেঙ্গে দু'খান হয়ে যায়। এখন মান্দারিনরা ওদের প্রচারণার সত্যতা অস্বীকার করে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। এবং আগে ওদের কথা বিশ্বাস করেছে বলে মাফ চাইতে লাগল। অহেতুক ভীতি দূর করবার জন্যে ওরা অবিশ্রান্ত কাজ করে যাবে বলে প্রতিজ্ঞা করল। কিন্তু এর ভিতরই আরও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তর্জগতে শোধন কার্য চলছিলো। অবাক চোখে ওরা আমাদের নাবিকদের কাজ-কর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। তাদের হাল-চাল দেখে খোকা-খুকুদের মুখেও এক ধরণের স্নিগ্ধ পেলব হাসি ফুটে উঠছিলো। আর হবেই বা কেন? এমন মজার ব্যাপার কে কোথায় দেখেছে? শুধু মজার নয়, উৎসাহ ব্যাঞ্জকও বটে। কে কবে দেখেছে বলুন, লাল ঘাড় ওয়ালা মার্কিন নাবিকরা ছেলে-পুলের আয়ার কাজ এমন নিষ্ঠার সাথে পালন করছে।

এছাড়াও মণ্টেগু জাহাজে আরো অনেকগুলো মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। ছেলে বুড়ো সবার হাতে রুটির টুকরো, মিছরি, সিগারেট, ঠাণ্ডা পানীয় প্রভৃতি দেখা যেতে লাগল। এগুলো ওরা চুরি করে নেয়নি। চুরি যদি কেউ করে থাকে তবে সে নাবিকরা করছিলো তাদের উংকিনবাসী নতুন বন্ধদের জন্যে। একবার দেখলাম, ভীমদর্শন এক

নাবিক একটা শিশুকে হাটুতে বসিয়ে বেবীরুথ খাওয়াচ্ছে। এদের জন্যে নাবিকদের সযত্ন ব্যবহার আমাকে যেমন খুশি করছিল তেমনি শিশুর মায়েদেরও নিশ্চয় খুশি করে তুলছিল। অসংখ্য নাবিক এমনি ছোটখাট কাজের ভিতর তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মায়া-মমতার পরিচয় দিচ্ছিল। অথচ আমাদের ভীত শংকিত মোহাজেরদের কেউ এখনো অব্দি খোয়া যায়নি—হৃদয়বৃত্তির এই অজেয় শক্তির পরিচয় পেয়ে ওদের মন থেকে ক্রমশ কম্যুনিষ্ট প্রচারণার বিদ্বেষ বিষ ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

এই তিন দিনের প্রতি সকালে একজন পুরোহিত প্রতি ঘুপরীতে গিয়ে ধর্মার্চনা করে আসতেন। তাদের ধর্মার্চনা খোদার কাছে শোকর গুজারি গান খুবই মর্মভেদী। কারণ তাঁর সুদৃষ্টি এখন ওদের প্রতি নেই। তবু তাদের বিশ্বাস অখণ্ড। লক্ষ্য করলাম, ডেকে নাবিকরা অস্বাভাবিক শান্তভাবে কাজ করছে আর কান পেতে আছে এদিকে।

তৃতীয় দিনের সকাল বেলা। মণ্টেগু জাহাজ তখন সাইগন নদীর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে। পাইলট উপরে উঠে এলেন। তিন ঘণ্টা পর জাহাজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজধানী সাইগনে এসে পৌঁছল।

জাহাজ জেটিতে ভিড়লে মোহাজেরদের নামাবার ব্যবস্থা হল। এই অল্প সময়ে আমরা ওদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিলাম। এর ভিতরই আমাদের নাবিকরা ওদের কাছে আর দৈত্য-দানব নয় 'টটল্যাম'—ভারি চমৎকার। তিনদিন আগে যে বুড়ো লোকটি মার্কিন নাবিকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে উপর উঠতে চেয়েছিলেন, আজ তার কাঁধে ভর করে নির্ভয়ে নীচে নেবে গেলেন। গুলীতে তার চোখমুখ দীপ্ত। দু'জনের মুখে 'লাকী' সিগারেট। ছেলে-মেয়েরা তাদের আপন আপন প্রিয় নাবিকদের কাঁধে ঝুলে নামতে শুরু করে দিল। তাদের ক'জন আবার ট্রুপি নেড়ে নেড়ে চলে গেল। তবু, ওরা নেমে যাওয়াতে ওদের মনে যেমন একটা স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠছিল, আমাদের নাবিকদের মুখেও তার প্রতিভাস দেখা গেল। অসংখ্য মায়ের কোলের শিশু প্রাণবন্ত ছেলে-মেয়ে সবাই নেমে গেলো। ডেকের উপর এলোমেলো হয়ে শুতো যেসব বয়েসী লোক, ওরা চলে গেছে। কিন্তু মাছের গন্ধ, প্রাচ্য দেশীয় মরিচ, মশলা প্রভৃতি আর আহার্যের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রয়েছে এদিক সেদিক। আমাদের জাহাজের কাছাকাছি

রয়েছে ফরাসী বিলাস পোত—'লা মারসেইলিন।' আমাদের ময়লা মাখানো ডেকের সাথে ওর শুচি-শুভ্র ডেকের কতোই না তফাৎ!

জেটিতে সামরিক সাহায্য উপদেষ্টাদল এবং মার্কিন মিশনের প্রতিনিধি-বৃন্দের সাথে আমাদের সাক্ষাত হল। ওরা নবাগত মোহাজেরদের পুনর্বসতির ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। তাদের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। জাহাজ থেকে নামবার পথে দাঁড়িয়ে আমি বাইরের ডকে ক'জন কুলী যোগাড়ের চেষ্টা করছিলাম। মোহাজের জিনিষ-পত্র নামাতে সাহায্যের দরকার। কিন্তু পেলাম না কোথাও। একজন লম্বা কৃশ, জীর্ণ রোগগস্ত লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আমার পাশে এসে বিড় বিড় করে বল্লেন, "ব্যাপারটাকে সহজ-ভাবে নিন, লেফটেনাণ্ট সবে তো দিবা নিদ্রার সময়। ওদের এতো তাড়াহুড়োর দরকার কি।" এতে আমার আইরিশ রক্ত গরম হয়ে উঠল। দল দাঁড়াল, নেভী গরম হয়ে উঠল আর্মীর উপর। আর্মী থেকে এল প্রত্যুত্তর। ওসবে মোহাজেররা পাচ্ছিল ভারি মজা। পরে এই মৃদুভাষী গরম মেজাজী জর্জীয় বিপ্লবী লেফটেনাণ্ট কর্ণেল আরউহন জোনাসের সাথে আমার বেজায় খাতির হয়। উনি সাইগনে সাহায্য উপদেষ্টা দলের অফিসে কাজ করেন। ডকের কাছে দাঁড়িয়ে এই বিশ্রি ঝগড়ার পরিণতি আমার কাছে ভারি আনন্দের জোনস আমার পরম বন্ধু। ইন্দোচীনের সেই দুর্যোগের দিনে তাঁর উপস্থিতি আমাদের কাছে খুবই ফলপ্রসূ ছিল।

মোহাজেরদের অবতরণ পর্ব সমাপ্ত হবার আগেই জাহাজ পরিদর্শনে এলেন ভিসলভের ভিকার এ্যপসটলিক বিশ পিয়েত্র মার্টিনো গো-দিন-থুক (ইনি তখন সাইগনে ছিলেন)। তিনি হলেন তেজস্বী প্রধানমন্ত্রী গো-দিন দিয়েমের ভাই। গো-দিন দিয়েম কখনো ফরাসীদের কাছে মাথা নত করেন নি। পরিস্কারভাবে তিনি বলে দিয়েছেন জেনেভা বৈঠকে ইন্দো-চীনকে যে দু'ভাগে ভাগ করা হলো এতে এক নতুন এবং মারাত্মক যুদ্ধের সূত্রপাত হবে। বিশপ ভিয়েৎমীনদের আশীর্বাদ করলেন আর ভিয়েৎনাম সরকারের তরফ থেকে মণ্টেণ্ড জাহাজের অফিসার ক্রুদের তাদের মিশনের জন্যে ধন্যবাদ জানালেন। খোদার কাছে তিনি আকুল প্রার্থনা জানালেন যাতে জগৎ থেকে দুঃখ হতাশাও রক্ত ক্ষয় বন্ধ হয়।

মোহাজেররা চলে যাওয়ার সময় প্রত্যেকের হাতে কাগজের ব্যাগে দু'পাউণ্ড করে চাল দু'প্যাকেট করে সিগারেট দেয়া হল। এসব জিনিসের

প্রত্যেকটিতে আমাদের জাহাজের নাম আমাদের মিশনের শিরোনাম 'স্বাধীন-তার পথে পাড়ি' লেখা ছিল। জেটিতে বড় খোলা ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুনর্বসতির জন্যে ওদের নিয়ে যাওয়া হলো। মার্কিন সাহায্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। অবতরণ পর্ব সমাপ্ত হলে জাহাজটিকে সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করা হল। সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা সংস্থা থেকে একদল কুলী পাঠানো হয়েছিল। মার্কিনদের পরিচালনায় ওরা লবণজল দিয়ে জাহাজের আগাগোড়া ধুয়ে দিল। সন্ধ্যে ছ'টার সময় 'লিবার্টিফল' পড়ল। এখন জাহাজের দায়িত্ব থেকে সবাই মুক্ত। সবাই এখন প্রাচ্যের পারী সাইগনে গিয়ে ঘুরে আসতে পারে। কী মজা, সেই মধ্যরাত্রে ফিরে এলেও চলবে।

ভালো ফরাসী মদ টেনে অর্ধচেতন হয়ে সবাই ফিরেছে। তবু মিশ্রি একটা গন্ধ যেন অনুভব করছিলাম।

ক্যাপ্টেন ককস এই পাড়ির সরকারী রেকর্ড পোষ্ট করছিলেন। আমরা সবশুদ্ধ দু'হাজার একুশ জন লোক নিয়ে এসেছিলাম। দু'জন পথে মারা যায়, সলিল সমাধিই তাদের কপালে জোটে। আমাকে চারটে শিশুর জন্মের সময় তদারক করতে হয়। মা ও ছেলে সবাই সুস্থ। একটি শিশুর গবিত বাবা মা তার নাম রাখে 'থিংকভন এ, কে, এ মণ্টেণ্ড ৯৮ থার্ম'।

ভিতরে যাবার আগে একবার ডেকে এসে দাঁড়ালাম। নেভী-ডাক্তার হয়েছি বলে ভারি গর্ব অনুভব করলাম। স্বগতোক্তি করলাম: "ডুলী, তুমি যা দেখেছ, করেছ—তা সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। তোমার সমস্ত জীবনেও এমন মুহূর্ত্ত আর আসবে না, যা এই অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যাবে।" সত্যি সেদিন আমি তাই ভেবেছিলাম।

হাইপঙে ফিরে এলাম আবার। আরেক বোঝাই মোহাজের নিয়ে ফিরে চললাম। এটাই আমার সর্বশেষ 'কার্গো-রান' বৈ দ্য এলভের জেটিতে এখন অনেক জাহাজ, চারটে এ, পি, এ, (সৈন্যবাহী জাহাজ) আর আমাদেরটির মতো তিন খানা এ, কে, এ।

মন্টেগু জাহাজ এখন খুব প্রসিদ্ধ। কারণ আমাদের জাহাজে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত। বেশ বড় পায়খানা। ভারি চাউলাইন, শক্ত মিডি, ময়লা বের হবার ইউনিট প্রভৃতি দিয়ে আমাদের জাহাজ ঠাসা। অন্যসব জাহাজে সবে এসব ব্যবস্থা চলছিল, বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে যাবার জন্য। তাই আমাদের উপদেশ গ্রহণে ওরা ছিলো উৎসুক।

একদা নবাগত এক জাহাজে মেডিকেল এবং স্যানিটেশন সম্পর্কে বক্তৃতা করবার আমন্ত্রণ পেলাম। ডেকে গিয়ে দেখি জাহাজের ক্যাপ্টেন পাশাপাশি এক ফরাসী জাহাজে ইংরেজিতে আদেশ দিচ্ছেন। ফরাসী ক্রুরা ইংরেজি জানত না। তাই পরিস্থিতি ভারি মজার দাঁড়াল। ফরাসী ভাষা আমি বেশ ভালো বলতে পারি। তাই ভাবলাম, বিদ্যেটা একবার কাজে লাগানো যাক।

স্কিপার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডাক্তার এখন নয় পরে আসবেন।"

গলাটা পরিস্কার করে বললাম, "মাফ করবেন, স্যর,···কিন্তু" "আহা আমি বলছি, পরে হবে।"

"ক্যাপ্টেন, আমি ফরাসী ভাষা বলতে পারি। ভাবলাম, যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।" শান্ত কণ্ঠে বললাম।

'তাই নাকি, এতোক্ষণ বলেন নি কেন" উনি প্রায় গর্জন করে উঠলেন, "ব্যাটাদের বলে দিন, বাইরে থাকতে আর চীনা কায়দায় পাশে ভিড়তে।"

চীৎকার করে ফরাসীতে আদেশটা জানিয়ে দিলাম। জাহাজখানা গতি কমিয়ে আমাদের জাহাজের পেছনে এসে দাঁড়াল। ফরাসীটার কাছ থেকে একটা কৃতজ্ঞতাসূচক স্যালিউট পাওয়া গেল। স্কিপারও কর্কশ

কণ্ঠে একবার ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু যতোক্ষণ ওখানে ছিলাম, লক্ষ্য করলাম, তার চোখে কেমন জানি একটা ঈর্ষাক্ষুব্ধ দৃষ্টি।

এর পর থেকে শুরু হল নতুন ঝামেলা। চারদিকে রটে গেল যোয়ান ফুলী আবার ফরাসীও কইতে পারে। কলোনীর লোকজনের সাথে কথা কইতে বেশ সুবিধা হবে এবার। আর যায় কোথা, মেডিকেল প্রাকটিসের বাইরে এ রকম অনেক কাজ অতিরিক্ত ডিউটি স্বরূপ এসে আমার ঘাড়ে চাপল।

ঠিক এই সময় রিয়ার এডমিরাল লোরেঞ্জো এস ম্যাবিনের ফ্লাগশীপ এসে হাজির। এডমিরাল এই টাস্ক ফোর্স ৯০-এর সর্বাধিনায়ক। এই পারাপারের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। এই দুর্যোগের দিনগুলোয় তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। কাজ আদায়ের খাতিরে তাঁর সঙ্গে কখনো সৌজন্যও দেখিয়েছি। কিন্তু এই শেষ যাওয়ার আগে ছাড়া ইতিপূর্বে তাঁর সাথে দেখা করবার সুযোগ আমার হয়নি। জানলাম, উনি আমার সংস্কারমুক্ত মনের কথা জানেন। এবং তাতে তাঁর আন্তরিক সমর্থনও রয়েছে। আমাকে তিনি আদেশ দিয়ে গেলেন, এখন থেকে রিপোর্ট যেন ফ্লাগশীপে যুক্তরাষ্ট নৌবাহিনীর মেডিকেল কোরের কোর্স মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন জেমস গ্রিণ্ডেলের কাছে পাঠাই। তিনি জানালেন, হাইপঙ শহরে তিনি প্রতিষেধক ঔষধ-পত্তর এবং স্যানিটেশন ইউনিটের ব্যবস্থা করছেন। পরে জানলাম, এডমিরাল সেবিন ফরাসীদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন তীরে আঠারো শো লোক পাঠিয়ে অভ্যর্থনা কেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্য। তাঁকে মাত্র আঠারো জন পাঠাবার অনুমতি দেয়া হল। শহরটায় তখন মোহাজের ভর্তি। এবং শীগগির নানা রকম ট্রপিক্যাল ডিজিজ ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা যথেষ্ট। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা যেতে পারে। আর সে রোগ মোহাজেরদের আক্রান্ত করে আমাদের ক্রুদের এবং সাইগন শহরে (যেখানে সবে আমরা ছিন্নমূল দুর্গত মানুষদের রেখে এসেছি) সংক্রমিত হতে পারে।

ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডেল আমার কাছে একটা প্রস্তাব করে বসলেন। বল্লেন, "দ্যাখো ডক্টর, তোমায় আমরা এই ইউনিটের মেডিকেল অফিসার করে দেবার কথা ভাবছি। মানে, শুধু তাই নয়, দোভাষীও বটে। বুঝতে

পারছ নিশ্চয়ই, কাজটা একটা ভলান্টিয়ারী ডিউটি। একেবারে স্বেচ্ছাধীন। তুমি মন ঠিক কর।"

বাহুতে চার-চারটে সোনার ফিতা লাগানো একজন লোক কর্ণেলের পক্ষ হয়ে যখন একজন লেফটেনাণ্টকে দিয়ে কিছু করাতে চান তখন কাজের আর ভালো মন্দ কী! আমি রাজি হয়ে গেলাম। এই আমার তীরবর্তী মেডিকেল এবং স্যানিটেশন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হবার ইতিবৃত্ত। বলা বাহুল্য, এই ইউনিট থেকে যে 'অপারেশান কক্রোচ পরিচালিত হয়েছিল, তাও আমার নেতৃত্বে।

মণ্টেগু ছেড়ে চলে যেতে আমার ইচ্ছে ছিল না। গত এক মাসের জন্যে এটি ছিলো আমার নিজেরই জাহাজ। ওর অফিসার আর ক্রুরা ছিলো ভারি ভালো মানুষ। ওর যে নাবিকরা সেই প্রথম পাড়ির সময় আমার নির্দেশে কৃতদাসদের মতো কাজ করেছে, তাদের জন্যে ভারি কষ্ট হচ্ছিল। বিদায়ের আগে পর্যন্ত জানতে পারিনি আমার জন্যেও ওদের কী কষ্ট হচ্ছিল!

ডেকের উপর একটা ছোটখাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে ওরা আমাকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করল। তাদের একটা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ছিল। 'মণ্টেগু' জাহাজের লিষ্টিভুক্ত মানুষেরা প্রতিমাসে তাদের নিজেদের ভিতর থেকে একজন 'শিপমেট' নির্বাচিত করে। নির্বাচিত 'শিপমেটকে' একটা 'স্ক্রোল' উপহার দেওয়া হয় এবং তাঁর নাম জাহাজের সেরেস্তাখানায় লেখা হয়ে থাকে। ওরা আমাকে সেই মাসের শিপমেট নির্বাচিত করল। অফিসারদের মধ্যে এ পর্যন্ত আমিই এ সম্মান পেয়েছিলাম। লিষ্টিভুক্ত মানুষ হিসেবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করলাম। অন্যান্য অফিসাররা হয়তো তা করতো না। কিন্তু এই অস্বাভাবিক সম্মানে আমি সত্যি গৌরববোধ করেছিলাম। তাই আমার মতো আইরিশ রক্তের লোকের চোখ দিয়ে যখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, তা রোধ করা খুবই কষ্টকর হলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে, আমার নেভী জীবনে আমি আরো অনেক সম্মান লাভ করবো। করেছিও। কিন্তু সেদিনের সেই মণ্টেগু জাহাজের মানুষগুলোর প্রদত্ত সম্মান আমার মনে যতোখানি আসন জুড়ে রয়েছে, ততোখানি আর কোনোটাই পারে নি। সমস্ত অনুষ্ঠানের সময় শুধু মনে হচ্ছিল, কতোবার এই লোকগুলোকে বকেছি, জাহাজের জঞ্জাল সাফ করিয়েছি আর কতো কি!

অফিসের কাগজ-পত্রে আমি জাপানের য়ুকো সোকা নেভাল হসপিটালে স্থায়ী ষ্টেশন ডিউটিতে রয়েছি। মণ্টেগু জাহাজে আমাকে টি, এ, ডিতে যার স্বরূপ আনা হয়েছিল। দূরপ্রাচ্যে এরকম ব্যবস্থা সুপ্রচলিত। ছোট জাহাজগুলোতে ঠায় বসিয়ে না রেখে একজন লোক দিয়ে এভাবে বড়ো জাহাজগুলোতে মেডিকেল সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডেল যে এদিকে আমাকে হাইপঙে নবগঠিত 'প্রিভেনটিভ মেডিসিন ইউনিটে' পাঠানো ঠিক করে ফেললেন। তা নিয়ে শাসনতান্ত্রিক লালফিতার বেশ দৌরাত্ম্য দেখা গেল। যাহোক, খুব বেশী ঘাঁটাঘাঁটি হবার আগেই এর পরিসমাপ্তি ঘটল। আসলে জাপানে আমি যে হাসপাতালে ছিলাম তার কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন 'রুষ্টি'বল আমাকে ফিরে পেতে খুব উৎসাহী ছিলেন না। তাই এই প্রথমবার (শেষবার নয় কিন্তু) আমার টি, এ, ডি, অর্ডার অতিরিক্ত তিন মাসের জন্যে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

এডমিরাল সেদিন ফ্লাগশীপ 'ইষ্টসে' প্রিভেনটিভ মেডিসিন ইউনিটের অফিসারদের সাথে আলাপ হলো। প্রথম, নামজাদা মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন জুলিয়াস এমবারশন। উনিও আমাদের নেতৃত্ব করবেন। তারপর নাম উল্লেখ করা যায়, মেডিকেল সার্ভিস কোরের লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার এডমণ্ড গ্লিজন। হাইজিন এবং স্যানিটেশনের ব্যাপারে ইনি সবচেয়ে বিশেষজ্ঞ। তারপর ফ্লীট এপিডেমোলজিক্যাল কন্ট্রোল ইউনিটের লেফ-টেনান্ট রিচার্ড কৌফম্যান আর লেফটেনান্ট ডেভিট ডেভিস। ডক্টর ডেভিস আমাদের সঙ্গে মাত্র পনেরো দিন ছিলেন। ক্যাপ্টেন এমবারসন সঙ্গে করে কোরিয়া থেকে এক ডজন লিষ্টিভুক্ত লোক আনিয়েছিলেন। আর ডিক কৌফম্যানের সঙ্গে ছিল লেবরটারী টেকনিশিয়ানের এক ষ্টাফ। এড গ্লিজন এবং আমি শুধু নিজেদের যোগ্যতাগুণে স্থান পেয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডেল মিশনের অর্ডার পড়ে শোনালেন: "আমাদের কার্যনিরত কর্মচারীদের মধ্যে মহামারী আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বিদূরীত করা এবং আমাদের আওতাধীনে আগত মোহাজেরদের জন্যে মানবিক সেবাকার্য ও ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।"

শুনে আমার অবাক লাগল, এতবড় দুঃসাহসিক কাজের জন্যে আমাদের দল কি যথেষ্ট ছোট নয়! তখন যদি আমার ওরকম কাঁচা বয়েস না হতো তাহলে ব্যাপারটাকে অতো তলিয়ে দেখতে পারতাম না। আদেশনামা

পড়া হলে ক্যাপ্টেন গ্রিণ্ডেল বল্লেন, "অল্‌রাইট, জেন্টলম্যান, এই আপনাদের কাজ। আপনাদের অসংখ্য শুভেচ্ছা।" আমাদের সভা মুলতুবী হল।

এখন ডক্টর এমবারসন সম্পর্কে কিছু বলি। অফিস আদালতের সব দপ্তরে একজন কুটিল দৃষ্টির লোক দেখবেন, যার সঙ্গে কেউ সহজে মিশতে চায়না। কিন্তু ডাঃ এমবারসনের মতো নৈতিকবোধ সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী গোছের লোকও আপনি পেতে পারেন। তিনি ছিলেন খুব উঁচু শ্রেণীর নেতা। তাঁর অধীনে যারা কাজ করতো (তিনি বলতেন, সংগেই করছে) তাদের মন জয় করবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর। আমার দেখা খাঁটি দেশপ্রেমিকদের মধ্যে তিনি একজন। প্রয়োজন মত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দাবী আদায়ের ক্ষমতাও ছিলো তাঁর অপরিসীম। বৃত্তি হিসেবে আমার নৌবাহিনীর চাকরী পছন্দ করার অন্যতম কারণ ডাঃ এমবারসনের দৃষ্টান্ত। আমি জানি না, তিনি তা জানেন কিনা (বোধ হয়, জানেন না) তাঁর মতো মধুর স্বভাবের লোকের অধীনে কাজ করে যেমন আনন্দ আছে। তেমনি আছে গৌরব।

একদিন বিকেলে আমরা 'ইষ্টস' ছেড়ে খোলা বোটে চড়ে হাইপঙে চলে আসলাম। তারপর এক ফ্রেঞ্চ ট্রাকে চেপে শহরের সবচেয়ে ভালো হোটেলটিতে উঠলাম। ওঠার অবস্থা এতো জঘণ্য যে, গ্রিজনকে তার স্যানটেশন বিদ্যার অনেক যাদুকরী খেলা দেখাতে সে কৌদম্যানকে মশা আর ইঁদুর নিয়ে মাথা ঘামাতে হল। আমি তখনো বুঝে উঠতে পারছিলাম না, এই অর্দ্ধ মিলিয়ন কিংবা তার কাছাকাছি মোহাজেরদের জন্যে মানবিক সেবাকার্য ও ডাক্তারী চিকিৎসার ব্যবস্থা, কী বস্তু। অথচ, এর সমস্ত দায়িত্ব শীগগীর আমাকেই নিতে হবে। তাই ক্যাপ্টেন এমবারসনকে আদেশ দিয়ে আমর শিরদাঁড়া শক্ত করতে হচ্ছিল।

হংকঙের দক্ষিণে হাইপঙ। টংকিন উপসাগরে যে বদ্বীপ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, চীনের কংশী প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্ত ছাড়িয়ে মাত্র শ' খানেক মাইল দূরে এই বন্দর। হাইপঙের আবর্জনা সাফ হতো না। ইঁদুর, মশা, আর মাছিতে সারা শহর ছেয়ে আছে। বড়ো সামুদ্রিক বন্দরগুলোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। কিছু অংশে থাকে একতলা বাড়ি আকাশ চুম্বী প্রাসাদগুলো ব্যবসা-কেন্দ্র। কিছু অংশ জুড়ে আবাসিক এলাকা। নগরপ্রান্তে জলাভূমি। চোর, ডাকাত বদমাশ ছেলে-ছোকরাদের পার্টি। নিউইয়র্ক, মার্সেলাইস, মাইগণ প্রভৃতি সব শহরে এরকম দেখা যায়। হাইপঙে কিন্তু অবস্থা অন্য রকম। জলের উপর নির্মিত ডকগুলো ভারি চমৎকার। জেটি থেকে কয়েক ফুট দূরে চলে গেছে রেল লাইন। তার পাশে বড় বড় মাল-গুদাম, এক একটা এতো বড়ো যে, তার ভিতর অনায়াসে বেজবল খেলার জায়গা হতে পারে। এগুলো সব কংক্রীটের তৈরী। দরোজাগুলো খুব বড়—তিনখানা ট্রাক পাশা পাশি ঢুকতে পারে। এরপর দেখা যাবে সরি-সারি সাপ্লাই ডিপো। আর তার সঙ্গে বড়ো বড়ো হোটেল। সবগুলোর ছাউনী টিনের। এক বছরও আর নেই। এগুলো যাবে কম্যুনিষ্টদের করতলে। জেটির ওদিকে পৃথক দু'তিনটা ব্লকের মধ্যে কয়েকখানা খুব চমৎকার প্রাসাদ ছিলো। ওগুলো ফ্রেঞ্চ হাই কম্যাণ্ডের পক্ষে জেনারেল রেণে কডানি আর তাঁর ষ্টাফের লোকজন দখল করে নিয়েছিল। ওখানে ছিল একটি পার্ক। অনেকগুলো চমৎকার ফোয়ারা, মূর্তি আর কপোত পার্কের শোভা বাড়িয়ে দিয়েছিল। জেটির আরেকটু ওদিকে লাটভবন, পীতরঙের চুনকাম করা তিন তলা বাড়ি। পাশেই তার সিটিহল আর মেয়রের বাস ভবন। প্রাসাদগুলোর সাথে লাগানো প্রশস্ত লন আর মেহগিনীর সারি। তারপর শুরু হয়েছে শহরের বিশ্রি অবস্থা। ডকের সাথে সমান্তরালভাবে চারব্লক পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রধান রাজপথ রুপল বার্ট। সেদিকে সবকিছু আবর্জনাময়। বেশ্যাপাড়া, মেছোবাজার, নেটিভ কোয়ার্টার, ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার, ভাঙ্গা প্যাগোডা, ময়লা নদীনালা,

সিটি জেল আর সিটি হসপিটাল সব ওখানে। কয়েকটি সুদৃশ্য প্রাসাদ আর ডজন খানেক মার্কিন হাতের তৈরী 'কোনসেট' কুটীর নিয়ে ফরাসী নেভাল বেজ। ফরাসী নৌ-বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন এডমিরাল জামারী করেভিলে। বেজ থেকে পাততাড়ি গুটাবার পালাটা তিনি ভালোই চালাচ্ছিলেন। সমস্ত 'কোনসেট' কুটীরগুলো ঢুলে তিনি দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছিলেন। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ না করে বড় বড় প্রাসাদগুলো অক্ষত রেখে যা কিছু তুলে নেয়া সবই নিচ্ছিলেন, কিছুই ছেড়ে যাচ্ছিলেন না। অনেক গুলো প্রাসাদেই কংক্রীটের উপর সুন্দর করে এম, এফ. (মেরিণ ফ্রানচেইজ) কথাটা মুদ্রিত ছিলো। কম্যুনিষ্টদের হাতে ছেড়ে দেবার আগে এডমিরাল করেভিলে এগুলোও উঠিয়ে নিলেন।

শহরের দু'টো হোটেল—দি কনটিনেন্টাল আর দি প্যারিস। মার্কিন পদ্ধতিতে পানির ব্যবস্থা একটাতেও নেই। অবশ্য দু'টি হোটেলে যথেষ্ট বড় বড় ইঁদুর আর আরসুলা আছে। এত বড় আর আমি কোথাও দেখিনি। আরসুলাগুলোর দিকে ধাওয়া করলে ছুটে পালিয়ে যাওয়া দূরের কথা ওগুলোই ধাওয়া করে আসে। আর ইঁদুরগুলোকে দাবিয়ে রাখা আরো শক্ত। ভীষণ যুদ্ধবাজ! হোটেলের রুমগুলো সাজানো, বেশ বড়সড়। পুরনো অদ্ভুত মশারি খাটানো বিছানা আর দুখানা ভেলভেট পাতানো রঙচুট চেয়ার দিয়ে রুমগুলো। আমার হোটেলটি দ্বিতল। দোতলারই একটা ছোট্ট হল-ঘরে নাচ হতো। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত সেখানে সস্তা সংগীত বাজতো। হোটেলটির একটি গর্বের বস্তু ছিলো। নাচ কিংবা কয়েক ঘন্টার স্ফুর্তির জন্যে জন কয়েক ট্যাক্সি গার্ল মিলতো। কয়েকটি বাজে 'বার' ছাড়া শহরে এই হোটেলের নাচঘরের জুড়ি নেই। ঐ বারগুলোয় ফরাসী সৈন্যদের আমোদের জন্যে পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যবস্থা ছিল।

আমাদের মতো মার্কিনীদের প্রায় প্রত্যেকেই কিছুকাল প্যারীতে কাটিয়ে এদিকে এসেছি। অন্য সবাই যখন অক্টোবরে চলে আসে, তখনো আমি ওখানে ছিলাম একা। কয়েক হপ্তার মধ্যে আমি অর্কেষ্ট্রার প্রত্যেকটি গান শিখে ফেলি। আর গান শুনলেই বুঝতে পারি এখন সময় কত। যখন 'ব্লুজ ইনদা নাইট শুরু হল', বুঝলাম এখন সাড়ে নয়। আর যখন দশটা বাজল বোঝা গেল এবার 'টি ফর টু'। সাড়ে এগারোটায় শোনা যাবে 'লভ ফর সেল'।

প্রাচ্যের সর্বত্র বড় রাজপথে কিংবা পাশাপাশি রাস্তায় দু'একটা ইণ্ডিয়ান দোকান চোখে পড়বেই। টুকি-টাকি এটা-সেটা, ফরাসী প্রসাধনী, সস্তা সিল্ক-সিল্ক প্রভৃতি এখানে পাওয়া যায়। ভালো ভারতীয় খাবারের কয়েকটা রেস্তোরাও আছে। তবে একটু অপরিষ্কার। বাস্তুত্যাগের পর শুরু হবার প্রথমদিকটায় মিলিটারী কো-ওপারেটিভ ষ্টোরগুলোতে ফরাসী মদ আর টিনের খাবার পাওয়া যেতো। কিন্তু বেশীদিন পাওয়া গেল না। কারণ ফরাসীরা তাদের সামরিক বাহিনী দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। গত কয়েক মাস ধরে টংকিনে পাশ্চাত্য কোনো খাদ্য, মদ, এমনকি বোতল ভর্তি পানিও দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়াল।

শহরের রাস্তায় ভেড়ার পালে মতো জুতো পালিশ দেবার জন্যে ছেলেরা ঘুরে বেড়াতো। তাদের আমার ভারি পছন্দ। এই বাচচা ছেলেগুলো কিন্তু ভারি বদমাস আর চোর। তবু তাদের আমার ভালো লাগতো। ওরা আমার মস্তবড় কদর্য বুট জোড়া বারবার ঘষে, রঙ লাগিয়ে পালিশ করতো। কখনো শুধোতাম: "অংগ দি নাম ভিয়েৎ কোমপ?"—(কিরে তোরা কি মোহাজের হয়ে এই কম্যুনিষ্ট দেশ ছেড়ে চলে যাবিনে?) ভিয়েৎনামী ভাষায় এই প্রথম কথা আমি শিখি। ওরা জবাব দিতো: "হাঁ, শীগগির আমরা দক্ষিণে রওনা হচ্ছি" এই বাচচা ছেলেরা আমার 'জুলী' নাম জানতো। ওরা আমায় ব্যাক সী মী বলে ডাকতো। পরে জানলাম, এর মানে হল 'মার্কিণ নৌ-বাহিনীর ডাক্তার'। পরে আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে ওই বাচ্চাগুলোকে দিয়ে অনেক ছোট-খাট কাজ করিয়ে নেয়া যেতো। ওরা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতো তাতে। কে একজন একবার ওদের 'ছোট ডুলী' বলে ডেকেছিল। আমি অবশ্য তাতে খুশিই হয়েছিলাম।

হাইপঙের সবচেয়ে বাজে জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি হাইপঙের বাজারের কথা বলছি, খাঁটি একখানা প্রাচ্যের বাজার, সিনিল বি-ডি মিলের ছবির বাজার নয়। বড় রাজপথ রুপল বাটের এক-পাশে বিরাট এক এলাকা নিয়ে এই বাজার।

স্বাভাবিক অবস্থায় হাইপঙের লোকসংখ্যা এক লক্ষের মতো। কিন্তু উনিশ'শ চুয়ান্নর আগষ্ট মাসে আমরা যখন এখানে এলাম তখন চারদিক থেকে আগতরত মোহাজেরদের নিয়ে তা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বাক্স প্যাটরা,

বোচকা-বুচকি নিয়ে ওরা পার্ক, বাজার রাজপথ সব দখল করে বসেছে। এই আবর্জনা আর হট্টগোলের মধ্যে ফরাসী নাবিক আর বিদেশী সামরিক দল তাদের জিনিষ-পত্র সরিয়ে ফেলছিল। নগর বাসীরা ধন-সম্পদ নিয়ে পাড়ি দিচ্ছিল।

বাজারের একপ্রান্ত ঘিরে ফল-মূল, শাক-সব্জী, টেনিস-সু, চোরাই ক্যামেরা, বাইনুকুলার প্রভৃতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। খড়ের ছাউনিয়ালা অন্ধকার খুপরিগুলোয় দুর্গন্ধময় মাখন, মাছের তেল, পিঠে, মটর শুটি, ঠাণ্ডা শরবত, দেশীমদ ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। একটা ভেণ্ডার লাল মাংস ফেরি করে বেড়াচ্ছে। উপরটা কালো মাছিতে ছেয়ে আছে। এক হাঁটু উঁচু জায়গায় গরুর মাথা, পাখির চোখ, বাদুড়ের পাখা, কুকুরের অাঁতুড়ী, শুকনো আরসুলা ও হরেক রকমের মাংস বিক্রি হচ্ছে। ঔষধের দোকানগুলোয় বড় বড় পানির সোরাহীতে সাপ ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। ওখানকার কিছু পানির সঙ্গে অনুপান হিসেবে কিছু কুকুরের যকৃৎ—এই হল টংকিন বাসী-দের সর্বরোগের মহৌষধ।

বাজারের সবখানেই তীক্ষ্ণ, ঝাঝালো দু'টি মেহগিনী কাঠের বাজনা শোনা যাবে। তার মানে, ওখানে 'সুপ' বিক্রি হচ্ছে। ছেলেরা কাঠি বাজায়, তাদের বাপ-মা কালো কালো একটা পাত্র নিয়ে ঘন, সফেন স্যুপগুলো নাড়ছে। কয়েকটি হলদে মোটা কুকুর আর দুর্ভিক্ষে পেট বের করা রোগা শিশুর দল সতৃষ্ণ নয়নে ওদিকে তাকিয়ে আছে। তারপর তরকারির কথা। কাদামাখানো আলু, ঝকঝকে গাজর, আর খুব বড়ো বড়ো মূলা এখানে ঢের পাওয়া যাবে। এগুলো খেলেই আমাদের পশ্চিমা পেটে রোগজীবানুর আড্ডা হবে। গরু, ছাগল আর মানুষের দুধ এহপ্তায় খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। বাজারের কিছু অংশ একেবারে অসূর্যাম্পশ্যা। এখানে প্রাচ্যের চিলিসস 'নৌকমম' পাওয়া যায়। পচা মাছের তেল নিয়ে তাতে লবন দিয়ে তৈরী হয়। এই জিনিষই আমি আমাদের পাড়ির পয়লা দিন মণ্টেগু জাহাজ থেকে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলাম। হাঁটতে গিয়ে এক জায়গায় ক্যারামেনের দুর্গন্ধ, আদিম আর রাশীকৃত ভাণ্ডের দুর্গন্ধে আপনি আর এগুতে পারবেন না। তাছাড়া ভিখিরিদের কান্নাভরা কষ্টের আবেদন, ছেলে-মেয়েদের চীৎকার, হকারদের কর্কশ হাঁক-ডাক, দোকানীদের ফিস-ফাস, সব মিলে চারদিকে এক ভীষণ হট্টগোল। মেয়েদের

হয়েছে এক ভীষণ মুসকিল। পেটে অনাগত অতিথির বোঝা, পিঠে এক শিশু বাঁধা। আর কিছু মেয়ে খুশবো তেল দিয়ে সযত্নে মাথা আঁচ-ড়িয়েছে। পিঠে তাদের একটা করে ছেলে। ছেলেটির মাথায় খোস-পাচড়া গলে পূঁজ ঝরছে। তবু দোলনার টুপি বাঁধা তাতে।

এই অন্ধকার জগৎ পেরিয়ে অন্যদিকে এলে দিবালোক দেখা যাবে। এখানে রয়েছে ফুলের বাগান। যেন মুঠো মুঠো, সৌন্দর্য সাজানো। যেন নরকের পর একখানা স্বর্গ।

বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলোতে ব্যবহার হয় এমন সব জিনিষ বিক্রিরও একটা জায়গা আছে। ওখানে কাগজের মূর্তি, রঙ-বেরঙের পুতুল, খেল-নার জন্ত জানোয়ার আর গন্ধে ভরা ধীরে জ্বলা আগরবাতি। তবু চার-দিকে ভিখিরি ছেলেমেয়ে, হকার আর দোকানদারের চীৎকারে এ জায়গা-টাও গুলজার।

এই হল হাইপঙ। পরের মে মাসের মধ্যভাগ অবধি আমি এখানেই কাটিয়ে ছিলাম।

প্রাসাদ হোক আর পর্ণ কুটীর হোক ভিয়েৎমীনদের অনেকের বাড়ীর সামনে একটা আশ্চর্য জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। কয়েক কপি সাদা কাগজের উপর একটা বিকট ভঙ্গীর মুখ আঁকা। এ নিয়ে একটা পুরনো জনশ্রুতি প্রচলিত। কোনো এক সময়ে এখানকার দু' ভাই দৈত্য-দানবদের দিনের বেলায়ও দেখতে পেতো। তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিতেও পারতো। তখন স্বর্গ থেকে তাদের উপর ভার দেয়া হয়, লাল কাগজে এরকম ছবি এঁকে এই দৈত্য দানবদের যেন ভয় পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে, ওরা যাতে আর পালাবার পথ খুঁজে না পায়। মনে হয়, ভিয়েৎনামের সর্বত্র এই আশ্চর্য ফলদায়ক ছবি টাঙানো থাকে। আর সেই জনশ্রুতির দুই ভাই হয়তো কম্যুনিজমের ভূত তাড়াবার জন্যে দেশের অপর অংশে ঠাঁই নিয়েছে।

মোহাজের ভর্তি এই হাইপঙ শহরের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারবে (তার জন্যে আমার মতো ডাক্তার না হলেও চলে) বসন্ত, প্লেগ, টাইফাস, কলেরার জন্যে শহরটা পচে পেকে তৈরী হয়ে আছে! এ নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলাম না। জানি, কোনো কথার কোনো ফায়দা হবে না। 'আপনার প্রবৃত্তি প্রকৃতি অনুসারে, আপনি যদি অসহায় হন তবুও,

কাজে ডুবে থাকুন তবুও, দুর্গত মানুষদের একটু সাহায্য করুন, ফেরেশ-তাদের কিছু কম গুণসম্পন্ন যে মানুষ তার সম্মান রক্ষা করুন। বাস্তু-ত্যাগের পূর্বে সমস্তটা আমরা শুধু একথা প্রচার করতাম আর কাজ করে যেতাম। তাই হাইপঙ শহরে, শহরের বাইরে আমাদের ক্যাম্পে কিংবা নৌবাহিনীর ক্যাম্পে কক্ষণো মহামারী দেখা দেয়নি। এই খানেই তো আমাদের কাজের সার্থকতা।

নতুন কাজের ভার গ্রহণ করে আমি তার গোড়াকার ইতিহাস খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলাম। আমি জানতাম, লাওস, কম্বোডিয়া আর ভিয়েৎনাম এই তিনটি ভূখণ্ড মিলে ফরাসীদের সব চাইতে অর্থকরী উপনিবেশ ইন্দোচীনের পত্তন। আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল এই লাওসের মহারাজাই কোরিয়ার যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে এক ডিবিশন যুদ্ধ হস্তী দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

ডক্টর এমবারসন পুরনো ইতিহাসের কিছু সাধারণ উপকরণ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে সমর্থ ছিলেন। এড গ্লিজন, ডেভ ডেভিস আর ডিফ কৌফম্যানের জ্ঞান আমারই মতো টনটনে। তাই সবই শুনে শিখে রাখলাম।

আট বছরের যুদ্ধের পর ছ'হপ্তা আগে জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে উনিশ'শ ছাপান্ন সনের জুলাই মাসে জাতীয় গণভোট অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সতেরো অক্ষরেখায় ভিয়েৎনামকে দু'টি সাময়িক রাজনৈতিক প্রভাব যুক্ত এলাকায় ভাগ করে। এই চুক্তি ভিয়েৎনামকে দু'ভাগে ভাগ করে, কিন্তু সে নিজে এতে স্বাক্ষর দান থেকে বিরত থাকে। ইতিমধ্যে এগারো মিলিয়ন অধিবাসী-যুক্ত, এর দক্ষিণ ভাগ সাইগনে জাতীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। আর এক কোটি অধিবাসী-যুক্ত উত্তর ভাগ হো-চি-মীনের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎমীনদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। অনাক্রমণ চুক্তির একটা মূল্যবান শর্ত হলো: হাইপঙের কিছু অর্ধচন্দ্রাকৃতি এলাকা 'দুই পক্ষের জন্যে যুক্ত এলাকা' হিসেবে থাকবে। দক্ষিণ থেকে যারা উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের কাছে নির্বাসনে যাবে তাদের জন্যে এই এলাকা থেকে বাস্তুত্যাগ করবার ব্যবস্থা হতো। চুক্তি মতে দক্ষিণের যাত্রীদের শুধু অধিকার নয় সাহায্য দানের কথাও উল্লিখিত ছিলো। বাস্তুত্যাগ পর্ব পরিচালনার জন্যে কানাডা, পোলাণ্ড আর ভারতের প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত একটি মিশ্র নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করা হয়।

কিন্তু হাইপঙের পাশে এই ছোট্ট 'মুক্ত এলাকাটুকু' ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসে। এবং উনিশ 'শ পঞ্চান্ন সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে নির্দিষ্ট তারিখমত সমস্ত এলাকা, মায় হাইপঙ শহর অবধি কম্যুনিষ্টদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। স্পষ্টতঃ এটা একটা ভাঁওতা পূর্ণ চুক্তি। ভাঁওতাটা কোথায় তা একটু পরেই জানা যাবে।

কিন্তু, ভিয়েৎমীনরা ফরাসীদের এতো ঘৃণা করে কেন? আর ফরাসীরাই এখানে ভালো কাজ কী করেছে, যে জন্যে আমেরিকা তাকে সমর্থন দিচ্ছে?

দেশে এক বন্ধুকে আমি চিঠি লিখি, ভিয়েৎনামের উপর লেখা কিছু বই পত্তর পাঠাতে। মার্কিনবাসীদের কাছে ব্যাপারটা যে কতো গোলমেলে তা এই চিঠির ফলাফল দেখেই বুঝতে পারবেন। আমার বন্ধুটি ইন্দোচীনে আমার কাছে যে বইটি পাঠান, তার নাম হল, "ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা"।

কয়েক হপ্তা পর আমি বুঝতে পারলাম, এখানকার পরিস্থিতির উপর আমার মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছে। তাতেই উৎসাহিত হয়ে কার্বণ দিয়ে এতসব কথা লিখে বসলাম। পাছে উৎসাহী কেউ থাকলে যাতে নিরাশ না হয়।

ভিয়েৎনাম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার খুবই গুরুত্ব পূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। চীনের সোজা দক্ষিণে ভিয়েৎনাম। হাইপঙ থেকে মাত্র একশো মাইল দূরে চীনের ফাবসী প্রদেশ। ভিয়েৎনামের পূর্ব উপকূল হয়ে চলেছে চীন সমুদ্র। পশ্চিম সীমান্তে হল হাতী আর বাঘের জন্য প্রসিদ্ধ লাওস রাজ্য। দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত জুড়ে এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুত উন্নতিশীল জাতির অন্যতম দীর্ঘদিনের পুরনো সাম্রাজ্য কম্বোডিয়া।

উনিশ 'শ চল্লিশ সালে জাপান ভিয়েৎনাম দখল করেছিল। তিন মাসের মধ্যে ভিয়েৎনামের কাঁচামাল, বিমান বন্দর আর সামুদ্রিক বন্দর ব্যবহার করে জাপান কম্বোডিয়া, লাওস ফরমোজা, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া আর মালয় দখল করতে সমর্থ হয়। এর ফলেই সে অষ্ট্রেলিয়ার যম হয়ে দাঁড়ায় আর ভারতের প্রবেশ পথে হানা দেয়া শুরু করে।

হাইপঙ আর সাইগনের মতো বন্দর ব্যবহার করতে পেরেছিল বলে জাপান যুদ্ধাস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র পূর্বদিকে আমদানী করতে সমর্থ হয়। ম্যাক অর্থারের সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ঘটে। তাই এর ফলেই উনিশ 'শ বিয়াল্লিশ সালে ফিলিপাইন জয় করে নেয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে ভিয়েৎনাম হচ্ছে পৃথিবীর স্বাভাবিক রবার প্রস্তুতকারকদের মধ্যে চতুর্থ স্থানীয়। উত্তর আর দক্ষিণে দু'টো বদ্বীপ যথাক্রমে টংকিন আর কোচিনে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করবার মতো ধান জন্মে। তাছাড়া ভিয়েৎনামের পাহাড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধাতুর সন্ধান মেলে।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ প্রাচ্যের ঐশ্বর্য আবিস্কার করতে সমর্থ হয়। সবাই তখন আগ্রহে সাদামানুষের বোঝা কাঁধে তুলে নিল। ইংলণ্ড পাক ভারত উপমাহাদেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল। হল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরীয় (যাকে এখন ইন্দোনেশিয়া বলা হয়) দখল করে নিল। এবং ফ্রান্স ১৮৬০ এবং ১৮৭০ সালে ধনসম্পদ পূর্ণ বহু উপকথার স্মৃতি বিজড়িত ইন্দোচীনের রাজ্যগুলোর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল। তখন থেকে উনিশ 'শ চুয়ান্নর আগষ্ট ইস্তক ইন্দোচীন ফ্রান্সের উপনিবেশ।

ফরাসীরা ইন্দোচীনে অনেক চমৎকার কাজ করেছিল। ইন্দোচীনে ওরা প্রথম রবার গাছ আনয়ন করে খনি আর খনিজ দ্রব্যাদির উন্নতি বিধানের জন্যে অনেক কিছু করে, স্থলপথ ও জলপথের সুবন্দোবস্ত করে। সহস্রাধিক ফরাসী পরিবার এই উপনিবেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। ভিয়েৎমীনকে ওরা নিজের দেশ বলে ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা ভিয়েৎমীন থেকে যতো নিয়ে গিয়েছিল বদলানো ব্যাপারে অতো দরাজ হয়নি। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক কারণে ওরা ভিয়েৎমীনদের অনুন্নত, অনুগত আর শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। প্রায় দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের একটা জাতির জন্যে ওরা মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করেছিল। অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর চাইতে সে যে বেশী স্বার্থপর ছিল তা নয়। সে শুধু যুদ্ধধারারই অনুবর্তন করে চলেছিল।

উনিশ 'শ চল্লিশ সালে ফ্রান্স প্রায় বিনাযুদ্ধেই জাপানকে ইন্দোচীন ছেড়ে দেয়। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্যে সে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং আক্রমণ কারীদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নেয়, যাতে তার 'ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ববৎ' চলতে থাকে। এটা আরও মজার ব্যাপার যে সেই সরকারের একজন গন্যমান্য সদস্য জাঁ সেইনতেলী এখন আর কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎনামের

রাজধানী হ্যানয়ে একটি ফ্রেন্চ মিশনের দলপতি হিসেবে 'ব্যবসা বাণিজ্য পূর্ববৎ' বজায় রাখবার জন্যে কথা-বার্তা চালাচ্ছেন।

উনিশ 'শ পঁয়তাল্লিশে ভিয়েৎনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাও ফরাসীদের চেষ্টায় নয়—ইংরেজ ও মার্কিনীদের যৌথ প্রচেষ্টায়।

এসময় একজন লোক খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। জাপান অধিকৃত ভিয়েৎনামে তাঁকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডেই কাটাতে হয়। কিন্তু তাতে তাঁর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে। নাম তাঁর হো চি মীন। 'হো' মানে হোল 'যিনি আলোকপ্রাপ্ত'। তিনি বলতেন, জাপানীদের কাছ থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ফরাসীদের কাছে পুনবার অধীনতা স্বীকার করবার কোনো যুক্তি নেই। আমরা একটা শক্তিশালী জাতি। আমাদের শাসনভার আমরা নিজের হাতেই গ্রহণ করবো। 'ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক অব ভিয়েৎনাম' গঠন করে তিনি হ্যানয়ে নিজেকে প্রেসিডেণ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উনিশ 'শ বিয়াল্লিশ সনের উনিশে ডিসেম্বর ফরাসীরা হো চি মীনকে নির্বাসনে পাঠায়। কিন্তু তার সৈন্য-সামন্ত আজাদীর সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। প্রথম পদক্ষেপে ওরা এক হাজার স্বদেশী মেয়ের পেট কেটে নাড়ী ভূঁড়ি বের করে ফেলে। কেননা ঐ মেয়েগুলো ফরাসীদের জন্যে কাজ করছিলো, নতুবা তাদের বিয়ে করেছিলো বা তাদের সংগে বাস করছিলো। মার্কিনীরা এই জঘন্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেও হো চি মীনের উদ্দেশ্যের কথা ভেবে তাঁকে সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলো। কারণ তারা তাঁকে স্বদেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী বলেই গণ্য করেছিলো। সমস্ত এশিয়া জুড়ে এ ধরণের জাতীয়তাবাদীরা ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলো।

এ সময়টায় আমি প্যারিসের কলেজে অধ্যয়নরত ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, হো চি মীনের মুক্তি সেনাদের জন্যে (এঁদের বলা হয়—'দি ভিয়েৎমীন') কাপড় আর অর্থ সংগ্রহের অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো তাতে আমিও কয়েক ডলার দিতে কার্পণ্য করিনি।

কিন্তু উনিশ' শ উনপঞ্চাশ সনে কম্যুনিষ্টরা যখন চীন দখল করলো, হো-র আসল রূপ তখন ধরা পড়ে গেল। সোবিয়েৎ রাশিয়া, কম্যুনিষ্ট চীন, সোবিয়েৎ ব্লকের আর আর রাষ্ট্রগুলো তাড়াহুড়ো করে 'ডেমোক্রাটিক

প্রজাতন্ত্রী ভিয়েৎনামকে' স্বীকৃতি দিয়ে দিল। হো চি মীন গোড়া থেকেই মস্কোর দীক্ষায় দীক্ষিত ক্রীড়ানক।

উনিশ 'শ উনপঞ্চাশ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামকে কম্যুনিষ্ট কবল থেকে রক্ষা করবার মানসে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া শুরু করল। কিন্তু এবারও জনসাধারণের কাছে আমাদের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। দিয়েন বিয়েন ফুর পতন আর জেনেভার মর্মন্তুদ ঘটনার পরও এমন অনেক ভিয়েৎনামবাসী ছিলো যারা 'ভিয়েৎমীন' (গে চি মীনের দল) আর ফরাসীদের ঘৃণা করতো। কিন্তু ওরা মার্কিনীদেরও ঘৃণা করতে শুরু করলো। কেন না ফরাসীরা মার্কিন সাহায্য দিয়েই যুদ্ধ চালাচ্ছিল। সুতরাং স্থানীয় জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার আর তাদের সৌহার্দ্য অর্জনের ভার এসে পড়লো একদল ইউনিফর্মপরা লোকের উপর। সরকারীভাবে যাদের কাজ অন্য কিছু। এই দুরূহ কাজ সম্পাদনের ভার পড়লো তাদেরই উপর।

যাহোক কৃষাণ আর কুলীদের মধ্যে কিছু লোকের কাছে এই উনিশ 'শ আটচল্লিশ আর পঞ্চাশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কোনো তারতম্য বোধ ছিল না। তাদের কাছে দ্বন্দ্বমূলক ও লাল সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কিছু বলা নিরর্থক। কেন না তাদের ঐতিহ্য কিংবা অভিজ্ঞতায় এসম্পর্কে কোনো ধারণা জন্মাবার অবকাশ হয়নি। কৃষাণরা শুধু জানতো আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে থেকে যে বীর আর তাঁর সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধ করছে, কখনো বা ফরাসীদের পরাজিত করছে তা শুধু তাদেরই স্বার্থে। এবং ঐ সেনাবাহিনীতে তাদের নিজের গাঁয়ের লোকও রয়েছে অনেক। ওরা একে জানতো শুধু 'ভিয়েৎমীন জাতীয়তাবাদ' বলে। ওরা যে কম্যুনিজমের শিকলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তা তাদের জানা ছিল না। উপনিবেশবাদের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হওয়াই তাদের একমাত্র কাম্য। হো চি মীনের সেনাবাহিনী যেখানে ক্ষমতা লাভ করছে সেখানেই শুধু ওরা কম্যুনিজম কথাটা শুনতে পেল। কিন্তু তার কোনো তাৎপর্য বোঝা তাদের সাধ্যের বাইরে। ধীরে ধীরে নতুন প্রভুরা শুধু প্রতিশ্রুতি আর শ্লোগানের মাধ্যমে তাদের জমিজমা নিয়ে যাচ্ছিল, পরিবারের ছেলেদের বিদ্রোহী করে তুলছিল, সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে ফেলছিলো আর কুড়ি লক্ষ খৃষ্টানের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সৃষ্টি করছিলো।

উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল ইস্তক এভাবে যুদ্ধ চলল। কানসাস, দে কাটুর আর দেকসুনভিলের বাশিন্দা মার্কিনবাসীদের উপর প্রত্যক্ষভাবে এতে কোন আঘাত আসেনি। কিন্তু যেই দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধ শুরু হল তখন সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সম্বিত ফিরে পেলাম আমরা। ঘোরালো যুদ্ধের গতি দিয়েন বিয়েন ফুর দিকে এগিয়ে আসতেই স্বাধীন বিশ্বের মনে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রইলো না। সবাই বুঝলো এতে একদিকে যেমন ওয়াশিংটনের, অন্যদিকে তেমনি মস্কো আর পিকিঙের জীবন-মরণ স্বার্থ বিজড়িত। টংকিনে কিন্তু চরম বিপদপাৎ হয়ে গেল।

দিয়েন বিয়েন ফুর কথা আমাদের মনে আছে, মনে আছে পনেরো হাজার লোক কী অসীম সাহসে সেখানে যুদ্ধ করেছিলো। অসংখ্য ফরাসী সৈন্য প্রাণ দিল। দুর্গ অধিকৃত জেনে ওরা বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। আর ফ্রান্সের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ বলি দিচ্ছিল।

ইন্দোচীনের যুদ্ধ এই দিয়েন বিয়েন ফুতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে। উনিশ 'শ চুয়ান্নর মে মাসে এই পরিত্যক্ত ঘাটি ভিয়েৎমীনদের হস্তগত হয়। সে বছরই একুশে জুলাই জেনেভা 'চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। সর্ব-স্বীকৃত-ক্রমে যুদ্ধের অবসান হয়। সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ ডালেস প্রতিবাদ স্বরূপ চুক্তি সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসেন (ওয়াক আউট)। তখন তিনি মন্তব্য করেন, যুক্ত রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করতে পারে না। কারণ একটা দেশের অর্ধেক ভাগ কম্যুনিষ্ট অত্যাচারীদের কাছে সমর্পন করবার যে চুক্তি তাতে আমরা সম্মতি দিতে পারি না।

জেনেভা চুক্তির অনেকগুলি শর্ত ছিলো। সবচেয়ে মূল্যবান শর্ত হলো, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এলাকা হিসাবে ভিয়েৎনাম দু' ভাগে বিভক্ত হবে। একটি হল, সতেরো অক্ষরেখার উত্তর ভাগ—এক কোটি অধিবাসীযুক্ত টংকিন বদ্বীপ হো চি মীনের কম্যুনিষ্ট সরকারের হাতে সমর্পন করতে হবে। সতেরো অক্ষরেখার দক্ষিণ ভাগ এক কোটি দশ লক্ষ নাগরিক নিয়ে প্রধান মন্ত্রী (বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট) গো দিন দিয়েমের অধীনে থাকবে।

দ্বিতীয় দরকারী শর্তটি হ এলাকায় বাস করুক না কেন, স্বেচ্ছায় অন্য এলাকায় চলে যেতে পারবে। এব্যাপারে তাদের সাহায্য দান করা হবে। যদি ওরা উত্তরাঞ্চলের টংকিন এলাকার লোক হন এবং দক্ষিণে চলে যেতে চায়, তহলে তাদের প্রথমে হাইপঙ বন্দরে আসতে হবে।

সেখান থেকে জাহাজে চড়ে গন্তব্য স্থানে যেতে পারে। হ্যনয় আর হাইপঙের ক্ষুদ্র অর্ধ চন্দ্রাকৃতি এলাকা উনিশ 'শ পঞ্চান্নর উনিশে মে অবধি 'মুক্ত এলাকা' হিসেবে গণ্য হবে। ঐ দিনই এই সব এলাকা 'ভিয়েৎমীনদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

আগষ্ট মাসের প্রথমদিকে হ্যনয় আর হাইপঙে অগুণতি মোহাজের জড়ো হলো। সেখানেই ফরাসী আর ভিয়েৎমীন সরকারী কর্মচারীরা আমাদের অনুরোধ জানান, আমরা যেন টংকিন থেকে এই মোহাজেরদের সরিয়ে নিয়ে যেতে তাদের সেনাবাহিনীকে সাহায্য করি। যুক্তরাষ্ট্র তক্ষুণি সে প্রস্তাবে সম্মতি দিল। 'টাস্ক ফোর্স ৯০'—র উপর আদেশ জারি হলো আর দিন কয়েক পরই শুরু হলো আমাদের অভিযাত্রা। ফরাসী কম্যুনিষ্ট কিংবা মার্কিনীদের কেউ সেদিন এর ধারণা কী হবে তা বলতে পারে নি। ভিয়েৎনামে স্বাধীনতার স্বপক্ষে সেদিন এক উন্নত, মহৎ জাতি মানবিক মূল্যবোধের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছে। আজ আর তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভিয়েৎনাম এখনো অজেয় রয়ে গেল।

এই হল গোড়াকার ইতিহাস। এরই জের টানবার জন্যে আজ প্যারিস আর 'কনটিনেন্টালের' মতো ঘুনে-ধরা ধূলি-ভরা হোটেলে আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে।

দীর্ঘ কলেজ আর মেডিকেল স্কুলের দিনগুলোয় আমি এরিষ্টটল থেকে প্রাণীতত্ত্ব পর্যন্ত সবকিছু পড়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মোহাজের শিবির তৈরীর কোনো ছবক সেখানে পাইনি। আমার জ্ঞান ভাণ্ডারের এই শূন্যতা সম্পর্কে ডাঃ এমবারসন সজাগ ছিলেন না, অন্ততঃ সে রকম কোনো ইঙ্গিত তার কাছ থেকে পাইনি। মোহাজের নিয়ে প্রথমে যে ঝামেলায় পড়লাম তা খুবই স্পষ্ট। সে হল তাদের বাসস্থান সমস্যা। শহরের রাস্তা, নালা নর্দমার পাশে দেড় লাখের মতো মোহাজের অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে দিন কাটাচ্ছিল। সেখানে স্যানিটেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খড়ের মাদুর, জীর্ণ কাপড়-চোপড় প্লাষ্টিকের বর্ষাতি ওদের আশ্রয়ের আবরণ।

দু'দিন হলো হাইপঙে এসেছি। ক্যাপ্টেন এমবারসন আমার হাতে একজোড়া কাগজ-পত্তর আর নক্সা দিয়ে বললেন, "ডুলী তোমার কাজ হল, মোহাজেরদের শিবির তৈরী। এখানে সাধারণভাবে কিছু ধারণা করতে পারো, কাজে নেমে পড়ে দেখবে সব হয়ে যাবে। আর দ্যাখো, আমার যেন এসব ব্যাপারে আর বিরক্ত কোর না।

"আচ্ছা, স্যার।" বল্লাম বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত মোহাজের শিবির আর মেয়েদের খেলার মাঠের বিশেষ কোনো তারতম্য আমার কল্পনায় ছিল না।

শহরের মাঝখানে মোহাজের শিবির গড়া যায় না। তাই শহরতলীর দিকে আমাদের নজর ফেরাতে হলো। কিন্তু শহরতলীর অধিকাংশ এলাকাই ধানখেত কিংবা রেড রিভারের জলাভূমি। অবশেষে খুঁজে পেতে বেশ শুকনো একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল। শহর থেকে চার মাইল দূরে, হ্যানয় হাইপঙ রাস্তার উপরে। যানবাহন চলার উপযুক্ত ধূলিধূসর রাস্তা-গুলোই ভিয়েৎনামে 'হাইওয়ে' নামে পরিচিত। আমাদের এখান থেকে তখন 'বোম্বে কারটেইনের' দূরত্ব চল্লিশ মাইলের মতো। জেনেভা চুক্তি অনুসারে হাইপঙ শহর অক্টোবরের ভিতর অধিকৃত হয়ে যাবার কথা।

তাতে কম্যুনিজমের ঘাটি থেকে আমাদের দূরত্ব হবে পনেরো মাইল। জানুয়ারীতে আমাদের শিবির থেকে ওদের সীমানা দেখা যাবে।

এমেরিকান এজেন্সির কার্য-সম্পাদনের শ্লথগতি সম্পর্কে অনেক বাজে কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু হাইপঙ-এর ইউ, এম, ফরেন অপারেশান এডমিনিষ্ট্রেশনের প্রধান অধ্যক্ষ মাইক এডলারকে আমাদের পরিকল্পনার কথা অবগত করানোর সাথে সাথেই দিন কয়েকের মধ্যে তিনি জাপান থেকে চারশো বড়ো তাঁবু পাঠিয়ে দিলেন। একটা তাঁবুতে ষাটজন সৈনিকের স্থান সংকুলান হয়। তাতে আমরা এক শো বিশ কি তারও বেশী লোকের আশ্রয় দিলাম। তাঁবু খাটানোর ব্যাপারে ফরাসী সেনাবাহিনী তাদের মরক্কো সেনা দিয়ে সাহায্য করল। আমরাও কয়েক শো কুলী নিযুক্ত করলাম। তাঁবু খাটানোর পদ্ধতি ডাঃ এমবারসনের নক্সায় ছিলো। তিনিই ছিলেন সবকিছুর নিয়ন্তা। আমরা শুধু সাহায্যকারী। তাঁবু শ্রেণী দিয়ে কী করে শিবির গড়তে হয়, ভালো করে শিখে নিচ্ছিলাম।

ক'দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, প্যান শিবির গড়া হোল। বারোটি সারিতে তাঁবুগুলো খাটানো। সবসমেত এক শো উনপঞ্চাশ খানা তাঁবু। মাঝখানে বেশ চওড়া রাস্তা। বর্ষার মওশুমে পানিতে যাতে সয়লাব হয়ে না যায় তার জন্যে প্রশস্ত নালা-নর্দমা করতে হলো অনেক। এগুলোর জন্যে ঝামেলাও গেছে যথেষ্ট। হাঁটবার সময় একচোখ ওদিকে না দিলে কুপোকাৎ হবার সম্ভাবনা পুরো মাত্রায়।

শিবিরের চারপাশের প্রশস্ত ধান খেতগুলো পায়খানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ডাঃ এমবারসনের ঠিক করা কয়েকজন লোককে বাতাসের গতির দিকে পায়খানা এলাকা বেছে নেবার জন্যে নিযুক্ত করলাম। কিন্তু একটা সমস্যায় আমরা বড্ড বিব্রত হয়ে পড়তাম। মোহাজেরদের কী করে নিষেধ করা যায়, যেখানে ফ্লাশ-হীন পায়খানা রয়েছে সেখানকারই জলাভূমিতে আবার সাবান ছাড়া গোসল করা থেকে বিরত করা যায়। এক মাসের মধ্যেই এই মাঠগুলোয় কড়া জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটিয়ে দিতে হতো। এতে জীবাণু অনেক মরতো ঠিকই। কিন্তু তাছাড়া এগুলো ছিটানোর সময় যে সব মোহাজের প্যান্ট খুলে বসতো তাদের গায়েও লাগতো। পরে কয়েকটা তাঁবুতে আমরা মেরিনটাইপের খাদ তৈরী করলাম। দু'দিকে পা ফাঁক করে বসে পায়খানা করবার ব্যবস্থা

করে দিলাম। চারপাশে গোল করে বেড়া দিয়ে দেওয়া হল। মোহাজেররা সেই ছাউনীর মধ্যে ঢুকতো ঠিকই, কিন্তু খাদগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতো না। একাজে ভারপ্রাপ্ত আমার একজন সহকারী অবশেষে বেড়াগুলো এতো ছোট করে দিলো যে, ওরা শেষ অবধি সেগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হলো। এ না করে আর উপায় ছিল না তখন।

পরের মাসে এক সময় কমোডর ওয়াল্টার উইনের হেলিকেপ্টার খানা ধার করে আসলাম। এবং ঐসমস্ত এলাকার প্লেনের উপর থেকে ডি-ডি-টি ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলাম। বেশীর ভাগ মাটিতে আর কিছুটা আমাদের নাকে মুখে ছিটিয়ে পড়লো। মোহাজেররা ব্যাপার দেখে হকচকিয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে কেউ কেউ চীৎকার করে উঠল: "কী অদ্ভুদ এই মার্কিনী লোকগুলো! দ্যাখো না, কী-সব বিষ্ঠা আর বিদঘুটে সাদা পাউডার ছুঁড়ছে উপর থেকে!

ডি-ডি টির মেঘ ছড়িয়ে হেলিকেপ্টার তার আপন পথে চলে গেল।

কলোনীর দৃশ্য চোখে দেখতে ভারি চমৎকার লাগছিল। অবশ্য নাকে আর শোঁকা সম্ভব হল না। তবুও আমরা খুশি হলাম। নতুন কিছু শুরু করা গেল। তাঁবুর প্রথম কয়েক সারি আমি হাসপাতাল এলাকার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। একটা তাঁবু রুগী দেখার জন্যে, একটা নবজাত শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে, কয়েকটা ঔষধ-পত্র সরবরাহের জন্যে আর পাঁচ-ছটা কাহিল রোগী রাখবার জন্যে। শিবিরে মাতব্বর হিসেবে কাজ করবে এমন সব মান্দারিনদের জন্যেও কয়েকটা তাঁবু আলাদা করে রাখলাম।

আমাদের বেশ বড়ো একটা তাঁবু ছিল। সেখানে চা'ল আর খড়ের মাদুর মওজুদ করে রেখেছিলাম। চালের নিজস্ব গন্ধ তো আছেই, তাছাড়া মাদুরের রয়েছে বিশ্রি একটা বাসি গন্ধ। বর্ষাকালেই বিশেষ করে গন্ধটা প্রকট হতো। কিছু ক্যানভাস ছিলো এখানে, সেগুলোরও গন্ধ ছিল। আর যেসব কড়া জীবণুনাশক গুঁড়ো ব্যবহার করতাম তার গন্ধ তো সহ্যই করা যায় না! কোবম্যান বেকার আর হ্যারিসের ছিলো একটা হনুমান। জেসমিন তার নাম। সেও থাকতো ওখানে। অতো-গুলো হরেক কিসিমের সুগন্ধি-দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রন তদুপরি ওয়াশ

জায়গুলোর দুর্গন্ধ মিশে জায়গাটা এমন হয়ে গিয়েছিল, পরিদর্শকদের আর বলে দিতে হতো না আমাদের হেড-কোয়ার্টার কোথায়!

আমাদের প্রথম শিবিরের নামকরণ করা হলো: 'রিফিউজী ক্যাম্প নং ১ পাগোডা।' প্যাগোডার মতো পরিচ্ছন্ন বলে নয় শুধু নামটাও কেমন একটা প্রাচ্য প্রাচ্য ভাব আর ধ্বনি গুণসম্পন্ন ছিলো।

এটাই আমাদের প্রথম শিবির। পরে আরো অনেকগুলো তৈরী করা হয়েছিলো। কয়েকটির নাম করা যায়: ক্যাম্পসিমেণ্ট, ক্যাম্প শেল, ক্যাম্প লাছট্রে, জদিন দে এনফাঁতস প্রভৃতি। এখানে আমরা যত্র তত্র খেয়ালখুশী মতো ঘুরে বেড়াতে পারতাম। পুরনো সার্কাস পার্টির বিধ্বস্ত কর্মচারীর মতো আমার ষ্টাফ আর মোহাজের স্বেচ্ছাসেবকরা সবকিছু সহ্য করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

হাইপঙের 'ভিয়েৎনামীজ মোহাজের বহিষ্কার কমিটির' তত্ত্বা-বধায়ক ছিলেন মিঃ মাইভন হাম। উনি আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুতে পরিনত হন। তাঁর কাছে যা চাইতাম, তাই পেতাম। অতিরিক্ত কুলী থেকে শুরু করে মাথাওয়ালা লোক পর্যন্ত তিনি আমায় যোগাড় করে দিতেন। ফরাসীদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ লেগে থাকতো। কখনো কখনো এই অধৈর্য ডাক্তারের সঙ্গেও। আমরা প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যেতাম। অবশ্য এই পরিস্থিতি বেশীক্ষণ বজায় থাকতো না, কারণ দু'জনেই আমরা বুঝতে পারতাম যে নিজস্ব রীতিতে আমরা ভিয়েৎনামের নির্যাতিত মানুষগুলোর জন্যে প্রাণপাত করছি। মাই ভন হাম একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আরোপিত অশেষ দায়িত্বের প্রতি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যি স্মরণ রাখার যোগ্য।

বাইরের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে আমরা মোহাজেরদের ভালো করে দেখাশোনা শুরু করলাম। 'মেডিকেল তাঁবুতে' বসে রুগী দেখতে লাগলাম। মার্কিন সাহায্যের ঔষধ-পত্র দিয়ে গড়ে তিনশো জন থেকে চারশো রুগী প্রতি-দিন পরীক্ষা করতে লাগলাম। তাদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় রোগই ছিলো বেশী, যেমন সুপ্রচুর ছিলো ওয়ার্ম ইনফেকশন, ফাংগাস ইনফেকশান্স, ট্রেকোমা, টিনিয়া, টিউবার কিললোসিস প্রভৃতির রুগীও। প্রায় প্রতিদিন চারদিক থেকে এসব রোগের কথাই শুনতে পেতাম, সৈন্যারও বুঝতে পার-লাম ইঅ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

নৌবাহিনী থেকে আমাদের ইউনিটের জন্যে প্রতিটি মেশিনারী একটি ট্রাক, ওয়াটার ট্যাঙ্ক, একটি জীপ আর প্রতিষেধক ঔষধ-পত্র সরবরাহ করতো। আমাদের এলাকা দিয়ে শত সহস্র লোক পেরিয়ে যাচ্ছে বলে তাদের কাছে সরকারীভাবে আমরা সাবান, ড্রেসিং, ভিটামিন পিল, এসপিরিণ প্রভৃতি এটা সেটা চাওয়া খুব সংগত নয়। অক্টোবার থেকে আগষ্ট পর্যন্ত আমরা শিবিরের রুগীদের ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করবার জন্যে অন্য পন্থা অবলম্বন করলাম। প্রাচ্য দেশের সেই পুরনো, কিছুটা অসঙ্গত রীতি ধরলাম। কয়েকজন সহকারী নিয়ে আমি বোটে চড়ে কিংবা হেলিকেপ্টার নিয়ে উপসাগরের দিকে যাত্রা করি। আমাদের টার্গেট ছিল নিকটস্থ কোনো মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ। ডজন খানেক ভিটামিনের পেতল, আর ডজন পেনো-সিনের ফাইল, কিছু ব্যাণ্ডেজ, কিছু এন্টিবাইওটিকস আর হেমোষ্টেট, তাছাড়া ওরা খুশিমতো যা দিতো তাই চেয়ে-চিন্তে নিয়ে আসতাম। এভাবে নৌবাহিনীর দিল-খোলা সৌজন্যের ফলে আমরা প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের একটা বিরাট স্তূপ করে ফেলেছিলাম। এই উপহারগুলোর বদলে ওদের শুধু একটা আধটা লেকচার পেড়ে আসতে হতো। ওদের বুঝিয়ে দিতো হতো কী ঘটছে আর ওরা অমন সাধের ভিটে-মাটি ছেড়ে কেন পালাচ্ছে। কখনো বা আমরা প্লাষ্টিক আচ্ছাদিত ফরাসী ইন্দোচীনের বিরাট মানচিত্র নিয়ে যেতাম। তারপর সতেরো অক্ষরেখার ব্যাপারটা বেশ নাটকীয় করে তুলতাম। দেখেছি, বক্তৃতাগুলো ওরা বেশ মনোযোগের সাথেই শোনে। এভাবে বিছুটা সম্মানজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করে আমরা আমাদের ফার্মেসীর ষ্টক রাখতাম। কিন্তু ডিসেম্বরের দিকে সবাই চলে গেল। মাত্র চারটে কি পাঁচটা জাহাজ রইলো। তাদের কাছেও বারবার আর কতো চাওয়া যায়। তাই আমরা অন্যপথ ধরলাম।

ঔষধের জন্য দেশে লেখাটাই উচিত মনে করলাম। ট্যারামাইসিন ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ। তাই আমি নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনস্থ চার্লস ফিজার এণ্ড কোং ফিজার লেবোরেটোরিস ডিবিশনের কাছে চিঠি লিখলাম। আমি তাদের আমাদের কাজ, আমাদের মানুষ-জন, শিবির আর আমাদের সমস্যা—সব ব্যাপার খুলে লিখলাম। কয়েকটা ফটোও পাঠালাম। পরিশেষে স্বল্প সাহায্য—অন্ততঃ পঁচিশ হাজার ক্যাপসুল ট্যারামাইসিন পাঠাতে অনুরোধ জানালাম। জবাবে ফিজার কোম্পানী

পঞ্চাশ হাজার ক্যাপসুল পাঠিয়ে দিল। পরে ওরা কিছু পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন আর ম্যগনামাইসিনও পাঠিয়েছিল। সব কিছুর মোট মূল্য কয়েক দশ হাজার ডলার অবশ্যি হবে। আসল দামটা নির্ণয় করা আমাদের ধারণার বাইরে। আমার চিঠির জবাবে ইণ্ডিয়ানার ইভান্স ভিলেস্থ নিবাসী জনসন আমাদের কয়েক গ্যালন তরলীকৃত ভিটামিন পাঠিয়েছিল। প্যান এমেরিকান এয়ার ওয়েজ পাঠাল দশ হাজার বার সাবান। আরো অনেক প্রতিষ্ঠান নানা জিনিষ পাঠিয়েছিল। 'ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদী মার্কিন সমাজ' এভাবেই সাড়া দিয়েছিল। ওদের সাহায্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমরা মোহাজেরদের বোঝাতে শুরু করলাম : যেখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় হয়ে গড়ে উঠতে অনুমতি দেয়া হয়, সেখান থেকেই কেবল এ ধরণের সাহায্য লাভ সম্ভব। এই হাজার হাজার ক্যাপসুলের প্রতিটি খাওয়াবার সময় আর ভিটামিনের প্রতিটি ডোজ শিশুর মুখে পুরে দেবার সময়ে এই কথাগুলো বলা হতো : 'দ্যইলা মাই ভিয়েনট্যো'—এই হচ্ছে মার্কিন সাহায্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সত্যি বেশ বড় কাজ করেছিলো সেদিন। আমার নিশ্চত বিশ্বাস এধরণের বদান্যতা প্রদর্শন এই তাদের প্রথম নয়। দুঃখ প্রকাশ করে ওরা অনুরোধ উপেক্ষা করল না, পরীক্ষা করে দেখবে বলে প্রতিশ্রুতির ভাঁওতা দিল না। একটি মহান দেশের মহৎ প্রতিষ্ঠানের মতো উৎসাহের সঙ্গে ওরা সাড়া দিয়েছিলো। তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সাহায্যের ফলাফল জানিয়ে আমি চিঠি দিলাম। প্রত্যুত্তরে ওরা আমায় ধন্যবাদ জানালো। আমি যাদের কাছে আবেদন করেছিলাম, তাদের প্রত্যেকটি লোক সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়েছিল। এতে আমি আমার দেশের আত্মার সান্নিধ্য অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, সারা মার্কিন মুল্লুকের ধন-দৌলত যেন আমার ঔষধের সিন্দুকে এসে জমা হয়েছে। আমার কাজ ছিলো শুধু পাওয়া আর চাওয়া, চাওয়া আর পাওয়া। আমি তাই করছিলাম। ক্যাম্প দ্য লা প্যাগোদা একটা ভালো ঔষধের ষ্টোরে পরিণত হল। এখন শুধু কমিক বই আর আইসক্রীমের ষ্টক হতেই বাকি।

ইউ, এস, ও, এম, থেক প্রাপ্ত ঔষধ-পত্রের একটা ছোট খাট মালগুদাম ছিল মাইক এডলারের। এগুলো হাইপণ্ডের 'ভিয়েৎনাম পাবলিক হেলথ অফিসে' পাঠানো হয়েছিল। ওরা স্বেচ্ছায় ওগুলো আবার আমাদের

কাছে পাঠিয়ে দিতো। এটা মার্কিন সাহায্যেরই রকমফের। "ইউ, এস, ও, এম, থেকে ভিয়েৎনামে মার্কিন ডাক্তারের কাছে।'

ক্যাম্প দ্য লা প্যাগোদায় আমরা পানীয় জলেরও সুবন্দোবস্ত করলাম। আমাদের ইচ্ছা প্রত্যেক লোককে দিনে এক গ্যালন করে পানি দেয়া এবং এতেই আমাদের দিনে বারো হাজার গ্যালন পানি লাগতো। যন্ত্র-পাতি গুলোকে যদি পদক দেবার অনুষ্ঠান হতো তাহলে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক পদকের জন্য পানি পরিষ্কারক যন্ত্রের নাম অনুমোদন করতাম। ম্যারিন ফেরে সাপ্লাই ক্যাটালগের প্রামাণ্য একটা গ্যাস চালিত ইঞ্জিনওয়ালা পানি শোধক ইউনিট আমরা ব্যবহার করতাম। এই দ্রুতগামী ইউনিটটা মাঝে মাঝে বিগড়ে গেলেও লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার এড গ্লিজনের হাতে কেঁপে কেঁপে তিন শো দিনের মতো চলেছিল। পানির উৎস ছিল ধান খেতের জলাভূমি। প্রথমে পানি আটকানোর একটা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে, তারপর দু'টো কেমিকাল ভর্তি ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়ে, অবশেষে ক্লোরিন পরিশোধিত হয়ে তিন হাজার গ্যালনের বিরাট রবারের ট্যাঙ্কের মধ্যে এসে জমা হতো। এই 'নউক মাই' (মার্কিন পানি) মোহাজেররা পান করতো একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। কারণ তাদের কাছে বাজে জলাভূমির টাইফয়েড জীবাণুমুক্ত পানিই সুপেয়। মোহাজেররা হাত পা ধুয়ে বা জিনিষ-পত্র পরিষ্কার করে পানি নষ্ট করবে বলে পানি আনবার বিশেষ জলা-ভূমিটাকে আমরা তার দিয়ে ঘেরাও করে দিয়েছিলাম। একদিন সকালে দেখা গেল সেখানে সব পানিই কালো হয়ে রয়েছে। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, কোনো কৃষাণ কন্যা ভিয়েৎনামের ফ্যাশান মতে কাপড় রঞ্জিত করবার জন্যে দেশি রঙ ব্যবহার করেছে. কাপড়ে রঙ লাগানো সারা হলে বাকিগুলো সে পানিতে মিশিয়ে চলে গেছে। রঙ পরিষ্কার হয়ে না যাওয়া অবধি আমাদের পানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। তাছাড়া কয়েকবার আমাদের রবারের ট্যাঙ্কগুলো কেটে দেয়া হয়েছিল। খুব সম্ভব, অনিষ্ট সাধণের উদ্দেশ্যে কোনো কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন লোকই একাজ করেছে। এর উপর উৎসাহী ছেলে-পুলেরা ট্যাঙ্কে চড়ে ভিতরে কাঠের নৌকো ছুঁড়ে দিতো, কখনো নিজেরা লাফিয়ে পড়ে মজা করতো। শেষ অবধি পানির ট্যাঙ্কটার চারধারে আমরা কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দিলাম।

'নৌক মাই' (মার্কিন পানি) সম্পর্কে যখন কথা বলা হচ্ছে, আমার দু'জন সহকারী সম্পর্কে কিছু বলা যাক। একজন ঠিক সেনাবাহিনী ভুক্ত নয়, এডিয়েশান বোটসেহিনের মেট। তৃতীয় শ্রেণীর চকুরে। আমাদের কাজেই তাকে লাগানো যেত। নাম তার নরম্যান এম. বেকার। এই কাহিনী লিখিবার সময় 'ইউ, এম. এস, ফিলিপাইন সামুদ্রিক জাহাজে সে কাজ করছিল জানতাম। বাকি যার কথা বলছিলাম, তার নাম এডোয়ার্ড মৌগ্রে। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা দু'শো পাউণ্ড ওজনের হাসপাতালের সাহায্যকারী সৈনিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরে। মোহাজেররা ওদের খুব ভালোবাসতো। তাদের দু'জনকে দেখা যেতো শিবিরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাঁধের উপর স্প্রে করার যন্ত্রপাতি। পেছনে একপাল ছেলের দল। ভিয়েৎনামের ছেলেরা অপ্রতিরোধ্য—এই স্বাভাবিক ধারণা উল্টো হয়ে গেল। বরঞ্চ আমাদের সৈনিক দু'জনই ওদের দুনিবার আকর্ষণের বস্তু। একদিন ওয়াটার প্ল্যান্টের ওখানে একটু অস্বাভাবিক শোরগোল শোনা গেল। ওদিকে গেলাম কী ঘটেছে দেখার জন্যে! বেকার আর মৌগ্রের ধারণা ওয়াটার ট্যাঙ্কের তলায় ময়লা জমেছে। সেগুলো পরিষ্কার করার জন্যে সে দু'জন ভিয়েৎনামীর ছেলে বেছে নিল। তাদের কাপড়-চোপড় খুলে নিয়ে এক এক জনকে এক কোমর পানির ট্যাঙ্কে ছুঁড়ে দিল। ওরা ছেলেদের হাতে বুরুশ আর সাবান দিয়ে দিল নীচে এবং পাশে ভালো করে পরিষ্কার করার জন্যে। ছেলেগুলো বেশ মৌজ করে সাফ করছিল। আর এদিকে অন্যান্য ছেলেদের উঠতে না দেয়ার জন্যে ওদের ছোট-খাট যুদ্ধ চলিয়ে যেতে হচ্ছে।

লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার এড গ্লিজন ছিলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি বিশেষজ্ঞ। প্রথমদিকে পানির ট্যাঙ্কে যাবতীয় গোলমাল সারানোর ব্যাপারে তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক। আসলে এই ইউনিটগুলো তাঁর হাতেই তৈরী। প্রথম থেকে শেষ অবধি এই কাজ তার হাতেই গড়ে ওঠে। তিনি যখন চলে গেলেন, তখন তার এই যাদুকরী কাজের ভার অর্পিত হলো বেকার আর মৌগ্রের হাতে।

পানির আধারগুলো আমার কাছে কেমন যেন ভীতিপ্রদ মনে হতো। প্রত্যেকবার আমি যখন লীডারের (ভারোত্তলন দণ্ড) উপর হাত রাখতাম অগ্নি নল দিয়ে হয় বালি বেরিয়ে আসতো 'নয় আর্তনাদ করে—ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যেত। তাই দূর থেকে ইউনিটের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হলেও বড় সহজে

আর ওটার ধার-কাছ ঘেঁষতাম না। কোরম্যানদের হাতে ওটার ব্যবস্থাপনা ছেড়ে দিতাম। এডমিরাল সেবিন একবার পরিদর্শন করতে এসে মৌগ্রেকে জিজ্ঞেস করলেন পানির স্বাদ কী রকম। মৌগ্রে সসম্মানে জবাব দেয়, "তা তো" জানিনা, স্যার, নিজের তৈরী জিনিষ হলেও চোখে দেখিনি কখনো।

ইউনিটের মধ্যে কিছু গোলমাল দেখা গেলে আমি বেকারকে আমার জীপখানা আর একপ্যাকেট-সিগারেট দিয়ে ডাঃ এমবারসনের কাছ থেকে শেখা আদেশের সুরে বলতাম, বেকার, বাজে জিনিষকে ঠিক করে নাও, যে কোরে পারো। আর দ্যাখো, এসব ব্যাপারে আমায় ঘাঁটিও না কিন্তু!"

কয়েক ঘন্টা পর বেকার কিছু লোক নিয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেকের হাতে সস্তা ব্রাণ্ডি আর মার্কিন সিগারেট। আমি জানতাম না কোথোকে এই ফরাসী মিস্ত্রিগুলো আর মেশিনের খুচরো পার্টসগুলো আসতো। তবে দেখতাম পানির কল ঠিক নতুনের মতো চলছে। বেকার এসব ব্যাপারে সাংঘাতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতো। কিন্তু হায়, ব্যর্থ উদ্যম ছাড়া এর উপর কোনো ডাক্তারি ফলানো আমার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। অবশ্য এনিয়ে সে আমায় বিরক্ত করতো না কখনো।

আমাদের প্রথম মোহাজের শিবিরটা পদস্থ পরিদর্শকদের রীতিমতো আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এডমিরাল সেবিন, কমেণ্ডার ওয়াল্টার উনে (যিনি এডমিরালকে টাস্ক ফোর্সের কম্যাণ্ডার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ছিলেন), জেনারেল জে, লটন কলিন্স (যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রাক্তন চীফ অব ষ্টাফ, বর্তমানে ভিয়েৎনামে প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা) জেনারেল "আয়রন মাইক" ও ডানিয়েল (সাইগনের সামরিক সাহায্য উপদেষ্টা দলের প্রধান) এবং আরো অনেকে কাদা-মাটি পথ হেঁটে আমাদের কর্দমাক্ত ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করে যেতেন।

আমাদের এই ছোট্ট এলাকায় ভিয়েৎনামের গবর্ণর ছিলেন গিয়েন লুয়াত। দেশপ্রেমিক লোক। তাঁর শিক্ষালাভ হয় ফ্রান্সে। স্বদেশে ফিরে ইসয়ে একটা সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন। যুদ্ধের সময় ফরাসীদের সাথে অফিসার হিসেবে যুদ্ধ করেন। প্রায় প্রতি হপ্তায় তিনি ক্যাম্পে আসতেন। দেশের লোকের সাথে কথাবর্তা কইতেন। তাদের মনে সাহস আর উদ্দীপনা যোগাতেন তিনি।

হাইপঙের মেয়র ছিলেন মাই ভন বট। তিনিও প্রায়ই আসতেন, তবে গভর্ণরের মতো কেতাদুরস্তভাবে নয়। তিনি খুব সাদাসিধে লোক। ভারি চমৎকার লোক কিন্তু। আমেরিকানদের যারা তাকে জানতো, খুবই ভালোবাসতো।

ক্যাম্পের পরিদর্শকদের মধ্যে যাদের কেউ দু'চোখে দেখতে পারতো না, ওরা হলো কম্যুনিষ্ট এজেণ্ট। ওরা প্রতিদিনই আসতো। মোহাজেররা ওদের দেখলেই সন্দেহে অঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো। ওরা আমাদের বলতো: 'ক্যাম্প দ্য লা প্যাগোদার পাঁচ-খ তাঁবুতে একটা লোক আছে, সে বলে কিনা এখানে এসে মস্ত ভুল করেছে। সে বলে, আমাদের অবিলম্বে ফিরে যাওয়া উচিৎ। সত্যিকার জাতীয়তাবাদী 'ভিয়েৎমীনদের' সঙ্গে লড়বার জন্যে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ। সে এক ভারি বিচিত্র লোক।" পুলিশ দু'একদিন অন্তর ক্যাম্পে এরকম এজেণ্ট অনেক খুঁজে বের করতো।

হাইপঙের জনসাধারণ তাদের রিকশা করে আসতো আর দেখে যেতো শহরের চাইতে এখানে বাস করার কিছু সুবিধা-টুবিধা আছে না কি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এভাবেও অনেক লোক আমাদের এই নতুন বাসস্থান পরিকল্পনার শরীক হয়েছে।

ভিয়েৎনামে জনস্বাস্থ্য বিভাগের হাতে কিছুই প্রায় ছিল না। তবু যখন পেরেছে ওরা আমাদের কিছু দেশী নার্স দিয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশী লোকদের মতো ওরাও তাড়াতাড়ি দক্ষিণের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্যে উদ্যস্ত হয়ে পড়াতে ওরা আমাদের সঙ্গে বেশীদিন রইলো না। কিছু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মোহাজের বেছে নিয়ে আমরা মাস দু'মাস আমাদের সঙ্গে রাখতে রাজী করলাম। সাধারণ ক্ষেত্রে দশ দিন থাকাই নিয়ম। আমরা তাদের হাতধোয়া ও অন্যান্য মৌলিক বিষয়-গুলো শেখাতাম, ওরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিল। আমাদের সাহায্য করতে ওরা সবসময় উৎসুক থাকতো। আমরাও তাদের নার্সের আখ্যায় ভূষিত করলাম। ক্যাম্পের পরিচালনা, দোভাষির কাজ, ফাদার কনফেসারের কাজ, এমেরিকান ইমেজস কোরম্যাস, ওয়াটার প্লাণ্ট অপারেটর, ডাক্তারের কাজ প্রভৃতি ছাড়াও এবার আমাদের নার্সিং স্কুলের অধ্যাপনার কাজও নিতে হলো।

কয়েক হপ্তা পরের কথা। ক্যাম্পের কাজ পুরোদমে চলছে, এখন আমাদের এখানে ছোট-খাট অথচ বর্দ্ধিষ্ণু একটা সমাজ গড়ে উঠেছে। আমাদের নিজস্ব নাম আছে, সরকার আছে হাসপাতাল, সেনাবাহিনীর লোক আছে, পান খেকো নার্স আছে, নিজস্ব মুদীখানা অবধি রয়েছে। আমাদের দৈনিক রবাদ্দ রেশন ছয় শো গ্রাম চা'ল বেশ ভালো করে মেপে নেয়া হতো। তাছাড়া মাছ আর অন্যান্য যা কিছু পাওয়া যেতো তা তো আছেই।

সবশেষে করবো বলে একটা দরকারী ক্যাম্পের কথা এতক্ষণ উল্লেখ করিনি। সে হল আমাদের গীর্জা। খুব বিরাট এবং মহান কিছু স্থাপত্য শিল্পের নমুনা এতে নেই, চারিধার গুটানো স্বতন্ত্র একটা তাঁবু মাত্র। গীর্জার ভিতরে একটা কাঠের যজ্ঞবেদী। তার পাশে দিবারাত্র সংরক্ষিত থাকতো প্রভুর পবিত্র ভোজ। প্রত্যেক দিন ভোর সকালে ক্যাম্পের পনেরো হাজার লোকের কল্যাণ কামনা করে বন্দনা গীতি গাওয়া হতো। আমি যথার্থই অনুভব করতাম, এইসব হতভাগ্য মোহাজেরদের প্রার্থনা খোদা নিশ্চয়ই শুনতেন। ওরা কোন অনুগ্রহ তো চাইতো না। তাদের ছেলে-মেয়েরা আগামী কাল কি করবে সে নিয়ে খোদার কাছে ফরিয়াদ জানাতো না। তাদের প্রার্থনা আর গানে তাঁকে শুধু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতো। কৃতজ্ঞতা জানাতো তাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রয়েছে বলে।

তারপর ওরা প্রভুর মা স্বর্গীয় কুমারী ফতিমাকে সম্বোধন করে বলতো, "হে অশেষ দয়াময়ী কুমারী মেরী, স্মরণ রেখো, যারা তোমার নিরাপত্তায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তোমার সাহায্য চেয়েছে, তোমার মধ্যস্থতা কামনা করেছে, তারা কখনো তোমার কৃপা লাভে বঞ্চিত না হয়। আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই হে রাণীর রাণী।"

মোহাজেরদের ক্রমাগত যাওয়া-আসা চলল। তবু আমাদের শিবিরের গড়-পড়তা অধিবাসীর সংখ্যা পনেরো হাজার সীমা ছুঁয়ে রইলো। আমাদের প্রাথমিক কাজ হলো টীকা দেওয়া, অন্য রোগ থাকলে খুঁজে পেতে বের করা। কিন্তু আমাদের তার চাইতে আরো অনেক বেশী কিছু করতে হলো। রুগী দেখার তাঁবুতে বসে আমি প্রতিদিন তিন শো থেকে চার শো রুগী দেখা-শোনা করছি। তাও যাদের চিকিৎসা করা একান্ত অপরিহার্য, তাদেরই করছি। তা না করে কী করবো? তাদের কি ক্যাম্পে পচে মরতে দেবো? না, 'বেম্বো কারটেইনে' পুনশ্চ ফেরত পাঠাবো?

প্রত্যেক চাকুরীতে একটা নিয়ম আছে চাকুরেদের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে, হৃদয় গত প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না আর স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে কিছু করা যাবে না। সৌভাগ্যবশতঃ আমেরিকানদের আরও একটা নিয়ম ছিল। ওরা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারতো না। পরিস্থিতি খারাপ দেখলে চেয়ে থাকতেও পারতো না। আমার মনে হয়, এর জন্যে আমার মনে একটু বিশেষ প্রবণতা ছিল।

ক্যাপ্টেন এমবারসন আমার মনের খবর জানতে পেরে শংকিত হতেন। কারণ তাতে ক্যাম্পের কাজ বেড়ে যাচ্ছিল। আমি বলেছিলাম, মিছে মিছি যেখানে সেখানে স্প্রে করা আর শহরে লোক ধরে টীকা দেওয়ার কোনো মানে হয় না, এটা বিপজ্জনকও বটে। আমাদের এখান হয়ে যারা যাবে না তাদের জাহাজে উঠতে দেওয়া কিছুতেই হবে না। ক্যাপ্টেনকে একথা বলায় নতুন সমস্যার উদ্ভব হলো।

'ডক্টর' আমি বললাম, 'এই রুগ্ন মানুষদের জন্যে কিছু করবার সামর্থ আমাদের আছে। নিয়ম কানুনের কথা বাদ দিন। ছেলের বসন্ত হয়েছে বলে কোনো মা ও ছেলেকে আমরা কম্যুনিষ্টদের হাতে ফেলে দিতে পারি না। ওদের চিকিৎসা করে জাহাজে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে একটা স্পষ্ট বোঝা-পড়ার চিহ্নও ফুটে উঠেছিল। ডাক্তার হিসেবে আমার প্রস্তাবে তাঁর পুরোপুরি সমর্থন ছিলো। তিনি শুধু ভাবছিলেন হয়তো একজন যুবক ডাক্তারের মনের কথা—কোনো সমস্যাই যার চোখে এড়ায় না।

"অল রাইট, ডুলী" তিনি বললেন, "বসন্তের চিকিৎসা শুরু কর। আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই আমাদের কাজ করবার সীমা জানা আছে। এগিয়ে যাও, তোমার সাধ্যে যা পারো করে যাও।" এরপর থেকে টীকা দেয়া, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা এসব ছাড়াও আমাদের কাজের পরিমাপ অনেক বেড়ে গেল। অন্ততঃ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমাকে হাসপাতাল তাঁবুটি বড় করে অস্ত্রপচারের ব্যবস্থা করতে হলো।

এমন সময় আচমকা ওয়াশিংটন ডি, সি থেকে ক্যাপ্টেন এমবারসনের ডাক এলো। তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি রওনা হতে বলা হলো। যে কেট-প্লেন চীনা আরোহী নিয়ে তাইপে যাচ্ছিল অতিকষ্টে সেখানে আমরা তাঁর জন্যে একটা সীট যোগাড় করলাম। কম্যাণ্ডিং অফিসারদের এরকম বিদায় মুহূর্ত্তে আমার মনে কোনো ভাবাবেগের উদয় হতো না। কিন্তু এবার হলো। আমার উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে, চমৎকার বন্ধু হিসেবে তাঁর বিয়োগ ব্যথা আমার বুকে বাজল। তাঁর জায়গায় বদলী হয়ে এলেন এক্টর ব্রিটেন। ইনি এসেই চাইলেন ফ্লীট এপিডিমোল জিক্যাল ডিজিজ কন্ট্রোল ইউনিটের জন্যে একটি লেবরেটারী প্রতিষ্ঠা করতে। ক্যাসেবার মধ্যে আমরা তা করতে পারলাম না। কারণ মাইক্রোসকোপ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি খুবই দুর্মূল্য আর সেখানে চুরি যাওয়ার আশংকাও ছিলো। শেষ অবধি ফরাসী নৌবাহিনী আমাদের সমস্যার সমাধান করলো। এডমিরাল কোয়ারডিলের সহযোগীতাপূর্ণ ব্যবহারের ফলে আমরা একটা খালি মাল-গুদাম পেয়ে যাই। ওখানেই আমাদের পোর্টেবল লেবরেটারী প্রতিষ্ঠা করলাম। ক্যাম্প থেকে যে সব নমুনা সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলো দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হল।

আমাদের লেবরেটারী বেথেসডা নেভাল মেডিকেল সেণ্টারের মতো দেখাতো না বটে কিন্তু কাজ চলতো বেশ। কাঠের বড় বড় টেবিল আর শক্ত ফোল্ডিং চেয়ার আমাদের আসবাব-পত্র। বড় কর্তার জন্য যোগাড় করেছিলাম বেশ বড় একটা ভেলভেটের কৌচ। দেখলে

মনে হবে বুঝি সম্রাট জিয়া লঙের সিংহাসনাগার থেকে আনা হয়েছে।

ডাঃ এমবারসনের স্থলাভিষিক্ত কম্যাণ্ডার সিডনী ব্রিটেন ছিলেন লেবরেটারী ঘেঁষা মানুষ। এমবারসনের যেমন সবচেয়ে বেশী ঝোঁক ছিলো ফিল্ড ওয়ার্কের দিকে আর, জে, জি, দের মোহাজের শিবির তৈরী করার কাজ শেখানোতে; এরও তেমনি ঝোঁক ছিলো মহামারী সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়ায়। ডক্টর ব্রিটেন নেভীবেজে লেবরেটারী নিয়ে পড়ে রইলেন। আর এদিকে ক্যাম্প চালানো, রুগী দেখা—এসব চাপল অনেকটা আমার ঘাড়েই।

বৈকালিক উষ্ণতার জন্যে কয়েক ঘণ্টা ছুটি ছাড়া সারাদিনই আমাকে রুগী-পত্তর দেখতে হতো। এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় ক্যাম্পের মাতব্বর মান্দারিসরা আমাকে ভিয়েৎনামীজ ভাষা শেখাতো। ওদের কেউ কেউ ফরাসী ভাষা কিছু কিছু জানতো। তাতে কাজ চলতো। কয়েক মাস দস্তরমতো খেটে প্রয়োজন মাফিক ভিয়েৎনামীজ ভাষা আয়ত্ব করতে সমর্থ হলাম। সেই সংগে টংকিন এলাকার টানটাত, কয়েকটা ভিয়েৎনামীজ গল্পও শিখে ফেললাম।

এখন আমাদের দিন কাটছিলো ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে। কখনো কখনো ভারি মজার ব্যাপার ঘটতো। ডাঃ ব্রিটেন সদলবলে কতক-গুলো গোলমাল পাত্র নিয়ে ক্যাম্পে আসতেন—রুগী দেখার তাঁবুতে বসতেন। এই একশো পাঁচ ডিগ্রির দুঃসহ উত্তাপে তাঁর মাথায় থাকতো একটা জাঙ্গল ক্যাপ, পরণে সবুজ জাহাজী জামা, ট্রাউজার আর পায়ে ভারী বুট। ম্যালেরিয়া বাহী মশার উৎপাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাঁর এই জঙ্গী সাজ। সহকর্মীদের বসে তিনি নির্দেশ দিতেন। লসএঞ্জেলসের জেমস কব, ম্যাসাসুয়েটসের জোসেফ মীলো, কালিফোনিয়ার ডোনাল্ড হোয়াইট লক, ফিলাডেলফিয়ার ওয়াল্ট হোবান, আর দু'জনের বাসস্থান আমার জানা নেই, তাঁরা হলেন আর্ট প্রিকেট আর রবার্ট ব্রুসো। এই সহকর্মীবৃন্দ ভেনাস আর পেরিপেরাল ব্লাড স্মিয়ার সংগ্রহ করতো। এগুলো নিয়ে গবেষণা চলতো। আর ন্যাশনেল মেডিকেল স্কুলের শপিংলিষ্ট পূরণের জন্যে অসংখ্য জবাব লিখে পাঠাতো। এই কাজের সম্পর্কে আমি যদ্দুর জানি অন্ততঃ দু'টি ডাক্তারী ঔষধের আবিস্কার এতেই সম্ভবপর হয়।

এরি মধ্যে ক্যাম্পে বসে আমিও এক নতুন কাজ শুরু করলাম। মিছরি দিয়ে ছোট ছেলেদের মলের নমুনা দিতে প্রলুব্ধ করতাম। এই হাস্যকর কাজে আমাকে সাহায্য করতো সালেম-বাসী ডেনিস ডি, শেপার্ড। বয়সে এখনো বাচ্চা। ভারি চমৎকার ছেলে।

ভিয়েনামীজ ভাষায় এখনো আমার দখল অতি সামান্য। আমি শুধু বলতে শিখেছিলাম 'মল', 'নমুনা' আর 'আমায় দাও'। এছাড়া 'প্লিজ' তো আছেই। কিন্তু এই কথাগুলো যখন বাক্যে পরিণত করতাম তখন সবার হাসি পেতো। আমি বারবার স্পষ্ট করে কথাগুলো আউড়ে যেতাম, শেপার্ড মাথা নিচু করে একটু হাসতো আর ছেলেদের একটি করে কাগজের বাক্স আর মিছরি দিয়ে যেতো। কয়েকটা ছেলে করত কি, সেই বাক্সের মধ্যে মিছরিখানা রেখে দিবা বসে থাকতো। কেউবা ওখানে থুথু ফেলতো।

"আহ্হা করছ কি, দাও একটু নমুনা" আমি বলতাম।

তখন কেউ কেউ বাক্সগুলো নিয়ে চলে যেতো। ফিরে এলে দেখা যেতো কোনো কোনো বাক্সে ঠিক মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখবার মতো আর কোনোটায় কানায় কানায় ভর্তি—নমুনা। আবার কেউ কেউ বাক্স নিয়ে সেই যে যেতো আর ফিরে আসতো না। আমার শুধু ভয় হতো, না জানি ডাঃ ব্রিটেন আবার আমার এই সংগ্রহ অভিযানের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হন।

মেডিকেল সার্ভিসকোরের লেফটেনান্ট রিচার্ড কৌফম্যানও (পিটসবার্গ নিবাসী) ছিলেন ডাঃ ব্রিটেনের দলে। তিনি আর লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার গ্লিজন—দু'জনে মিলে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে শহরের কোথায় পানি সরবরাহ কম হচ্ছে, কোথায় নর্দমায় ময়লা জমে রয়েছে ওগুলো দেখে বেড়াতেন। ডিক করতো কি সবখানে ইঁদুর ধরার ফাঁদ বসিয়ে রাখতো। আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেখানেও বসাল। সে টাট্টু ঘোড়ার মতো সাইজের ইঁদুরগুলোকে জীবন্ত ধরত। তাদের লোমের মধ্যে চিরুণী চালিয়ে প্লেগের জীবাণু বাহক মশা ধরতো।

চীফ কব এবং প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল কোরম্যান জো মিলো বেশী উৎসাহী ছিলো ম্যালেরিয়াবাহী আর পীত রোগের জীবাণুবাহী মশাদের নিয়ে। ওরা পায়খানা, পানির কল, রোগী দেখার তাঁবু, আমাদের

হোটেলের কামরা এবং অন্যান্য পছন্দসই জায়গার চারধারে মশা ধরার জাল পেতে বসে থাকতো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর হসপিটালম্যান ডন হোয়াইট লক ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাইক্রোসকোপে ব্লাডস্মিয়ার দেখে এবং পার্সেন্টেজের ক্যালিস করে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতো।

সুতরাং আমরা মার্কিনীরা এখানে একটা বিচিত্র মানুষের দল গড়ে তুলে ছিলাম। শেপার্ড আর আমি মলের নমুনার পাত্র নিয়ে, কর আর মিলো মশার বোতল নিয়ে, হোয়াইট লক তার স্লাইড নিয়ে ডাঃ ব্রিটেন রক্ত নিয়ে, এডগ্লিজন শহরের নালা-নর্দমার মানচিত্র নিয়ে, ডিক কৌফম্যান জীবন্ত ইঁদুর নিয়ে মেতে ছিল। এসময়ে সাইগনের কোনো না কোনো মোহাজের যুক্ত রাষ্ট্রের অদ্ভুত চালচলন আর সংগ্রহের ম্যানিয়াযুক্ত হাইপঙে নিবাসরত লোকগুলো সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখছিলো।

অক্টোবরের শেষের দিকে দেখা গেল আমরা প্রতিটি বিভাগে হাজার হাজার নমুনা সংগ্রহ করেছি। ডাঃ ব্রিটেন ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। এই সময়ে ফরাসী নৌবাহিনী এডমিরাল সাবিনকে জানালো যে এখানে যে সব মুক্ত এলাকা রয়েছে সেখানে কম্যুনিষ্টদের সাথে সম্পর্ক খুবই উদ্বেগজনক। সুতরাং কিছু মার্কিনবাসী হাইপঙে থাকা বাঞ্ছনীয়। ফরাসী এবং আমাদের কাছে এখানে থাকার প্রশ্নটা অস্পষ্ট, তাছাড়া এই ভীতিটা সুস্পষ্ট যে, 'ভীয়েৎমীনরা' যে কোনো মুহূর্তে এই বন্দরটি 'মুক্ত' করে আমাদের 'বন্দী' করে নিয়ে যেতে পারে। ওরা ইতিপূর্বেই টংকিনের রাজধানী হ্যানয় দখল করে ফেলেছিল। হ্যানয় এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। মুক্ত এলাকাও হাইপঙের আশেপাশে মাত্র কয়েক মাইল জুড়ে রয়েছে। জেনারেল রেনে বসনী তাই হাইপঙকে "রক্ষণ-বেক্ষণের জরুরী রাষ্ট্র" বলে ঘোষণা করেছিলেন। এড গ্লিজেন ডাঃ এমবারসনের ওয়াশিংটন যাবার কয়েক হপ্তা পরে চলে গিয়েছিলেন। কম্যাণ্ডার ব্রিটেন আর লেফটেনান্ট কৌফম্যান অক্টোবরে জাপান চলে গেলেন। যে সব কোরম্যান এফ-ই-ডি-সি ইউ ইউনিটে কাজ করেছিলো তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

তিনজন সহকর্মী দিয়ে আমাকে রেখে দেওয়া হলো। একজন নবাগত ডেনিস শেপার্ড; দ্বিতীয় তুলনাহীন পিটার কেসে আর মহান

নরম্যান বেকার। বেকার আমার সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল। মাত্র এক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন নেভাল মেডিকেল অফিসার, মোহাজের শিবির এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলীর সর্বাধিনায়ক। তার কাজ ছিলো উপস্থিত কর্মচারীর আদেশ পালন। কিন্তু সব সময়ই সব কাজ নিজেকেই চালাতে হয়েছিল। খোদার কৃপায় আর আন্দাজী বিদ্যার মাহাত্ম্যে বাকী আটমাস আমি এই সমগ্র ইউনিট পরিচালনা করে চললাম।

প্রতিদিন আমি আশা করতাম, আমার উপরতলা কেউ এসে আমাকে অব্যাহতি দেবেন। কিন্তু কেউ এলেন না। কেউ না—আমার পেছনে যে ইতিহাস তা শুনলাম। দিন কয়েক পরে এডমিরাল স্যাবিনই আমাকে বলেছিলেন—ক্যাপ্টেন এমবারসন যাবার সময় তাঁকে বলে গিয়েছিলেন "হাইপঙের পরিস্থিতি ভয়াবহ। এখানে যতো কম লোক থাকে মঙ্গল। ডুলী কাজটা ধরতে পেরেছে। সে একাই ভালো করে চালিয়ে নিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।"

ঠিক নভেম্বরের মধ্যভাগ তখন। আমাকে "কম্যাণ্ডার, টাস্ক ইউনিট ৯০, ৮, ৬" পদে নিয়োগের ফরমান এলো। দশমিক অংশগুলোর মানে হল আমার পদ যথার্থ মর্যাদার কিছু নীচে। কিন্তু আমি খুব গর্ব অনুভব করলাম। সে সময় কোনো মাথা খারাপ লাইন লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার নিরাপত্তার খাতিরে সাব্যস্ত করলেন। আমাদের মিশন 'অপারেশান ককরোচ' নামে অভিহিত হবে। যতোসব!

প্রায় প্রতিদিন ভরসন্ধ্যেয় দিনের কাজ সাঙ্গ হলে আমি তাঁবুতে যেতাম। সঙ্গে থাকতো ক্যাম্পের মান্দারিন প্রধান। ওখানে গিয়ে কম্যুনিষ্ট একাকা থেকে নবাগত মোহাজেরদের সাথে আলাপ জমাতাম। ওদের সম্পর্কে আমার যেমন আগ্রহ, আমার সম্পর্কে ওরা তেমনি উৎসুক। আমি 'ভিয়েৎমীন শাসনে' তাদের জীবন-যাত্রা কিরূপ ছিল জানতে চাইতাম।

কম্যুনিষ্ট অত্যাচারে প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত টংকিনের এই মানুষগুলো সম্পর্কে এভাবে আমি অনেক কিছু জানতে পারতাম। তাদের ব্যক্তি মানসে ও জাতীয় মানসে তখন যে সংকট, সংশয় দেখা দিচ্ছিল তা আমি বুঝতে পারতাম। ওরা কে শত্রু কে মিত্র ঠাহর করতে পারে না। জাতীয় গৌরব নানাভাবে বিলুণ্ঠিত হওয়ায় ওরা এখন বাইরের কাউকে আর সাদা চোখে দেখতে পারে না। তাই ফরাসীদের প্রতি ওদের তীব্র ঘৃণা। মার্কিনীদের প্রতিও। কেন না মার্কিনীরা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ ফরাসীদের ট্যাঙ্ক, বন্দুক আর প্লেন দিয়ে সাহায্য করেছিল।

খুব সম্ভবত এই মোহাজেরদের অনেকেও কম্যুনিষ্ট, 'পুলিশ ষ্টেট' প্রতিষ্ঠাকল্পে ওরা সাহায্য করেছিল। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে তা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সন্দেহ আর মোহমুক্তি ওদের এখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একদা হো চি মীন আর তাঁর সেনাবাহিনী ছিল তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের প্রতীক স্বরূপ। লালচীন থেকে 'ভিয়েৎমীনরা' যে 'দয়ার দান' গ্রহণ করেছে তা সত্যি কাজে এসেছে। চীনারাও তো একদিন রাশিয়া থেকে এই রূপ সাহায্য গ্রহণ করেছিল। তাইতো চীন আজ এক সম্পদশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অন্ততঃ 'ভিয়েৎমীন' রেডিও তো দিবারাত্র তাই প্রচার করছে!

কম্যুনিষ্টরা টংকিনের ধানের জমির মালিকদের কি ভাবে বিপর্যস্ত করতে হবে জানতো। এসব পরিবারের গৌরব নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলা শুরু করল। ওরা কৃষি সংস্কারের আশ্বাস দিল। সমস্ত জমিদারদের কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের দান করবে বলে প্রতিশ্রুতি

দিল এবং করলোই তাই। কিন্তু তাদের উপর এতো মোটা ট্যাক্স বসিয়ে দিলো যে ফসল তোলার পর দেখা গেল ওদের পকেটের অবস্থা আগের চাইতেও খারাপ।

'ভিয়েৎমীনরা' জলসেচের সুবন্দোবস্তের আশ্বাস দিল। জমির জন্যে এটা একটা বিরাট কাজ। টংকিন এলাকার জমিগুলো ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত। এক একটা ছোট্ট ফুটবল মাঠের মতো। এই মাঠগুলোর চারপাশে ছোট্ট কাদার পরিখা একটা থেকে আরেকটা বিচ্ছিন্ন করে রাখতো। ধানগাছ কখনো জলসিক্ত আর কখনো শুকনো রাখতে হয়। তাই অনেক সময় এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে পানি চালান দিতে হয়। মাঠটি নিচু হলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু সমান্তরাল কিংবা উঁচু হলেই অসুবিধা। তখন বালতিতে করে পানি ঢেলে আসতে হতো। দিনে কয়েকঘণ্টা করে এই কাজ যুগযুগান্তর ধরে চলে আসছে। হো চি মীন বললেন, "তোমাদের জন্যে আমি 'ওয়াটার হুইলের' ব্যবস্থা করবো। এতে তোমাদের পরিশ্রম বাঁচবে, হুইল দিয়ে পানি চালনার ব্যবস্থা করা হবে।" যখন তিনি ক্ষমতায় এলেন হাজার হাজার চাষীদের জন্যে ওয়াটার হুইলের ব্যবস্থা করলেন। এখানে কিন্তু একটু মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেল। এগুলো সব যখন রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত, চুক্তির শেষে চাষীদের কাছ থেকে শস্যের একটা ভাগ চাওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। আর ভালো করে বোঝা যায়, এই ভাগটাও খুব সামান্য নয়। তাই ওরা প্রতিশ্রুতি পালন করে যতোই সংস্কার সাধনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, টংকিনবাসীরা ততোই পালিয়ে বাঁচবার স্বপ্ন দেখেছে। তাই স্বেচ্ছায়, বিনা অত্যাচারে মাতৃভূমি ত্যাগের তথাকথিত প্রতিশ্রুতি ওদের কাছে একটা প্রহসনে পরিণত হল। সম্ভবত, ইতিহাসে আমাদের ক্যাম্পগুলোই একমাত্র সে মর্যাদা দাবী করতে পারে, যেখানে লোকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলো।

ওদিকে কম্যুনিষ্টরা জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল যে সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী মার্কিনরা টংকিনবাসীদের চুরি করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এরকমের নানা গালগপ্প ওরা দিনের পর দিন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যেতে লাগল। এখানে প্রত্যেক সকালে তরুণ তরুণীদের জন্যে 'উচিত শিক্ষার' ক্লাশ বসতো। সেখানে রাজনৈতিক প্রবররা মার্কিন বর্বরতা সম্পর্কে নানা কুৎসাপূর্ণ বানানো গল্প শুনিয়ে যেতো।

সাধারণ চাষাভুষোদের কাছে কয়েকটা গল্প মনে ধরতো। মার্কিনীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে শুচিবায়ুগ্রস্ত তা ওরা জানতো। তাই ওরা জাহাজে বমি করেছে বলে কোনো ভিয়েৎমীনের হাত কেটে দিতে পারে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আর মার্কিন মুলুকে রয়েছে অসংখ্য বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাদের কুলি-মজুরের দরকার। ঠিক মাপের জুতো যেমন পায়ের সঙ্গে লেগে যায়, ওদের ছড়ানো কাহিনীও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে।

'ভিয়েৎমীন'রা কৃষি সংস্কারের পরই গুরুত্ব আরোপ করেছিল প্রচার অভিযানের উপর। প্রচারের গুরুত্ব বাড়াতে হলে তা এক পক্ষে ভীষণ জোরদার করা বাঞ্ছনীয়। ওদের আগুনঝরা গলায় অন্য কণ্ঠ শোনাই যেতে পারবে না। 'লৌহ যবনিকা' থেকে ইউরোপে যেমন প্রচার চালানো হয়, এশিয়ায়ও এই 'বেম্বো কারটেইন' থেকে সেই ধরণের প্রচার চালিয়ে যাওয়া হল।

একটা জিনিষ এই যবনিকার রহস্য ভেদ করেছিল। মোহাজেররা আমাকে বলেছিল, ওদের ওখানে চোরাচালান হয়ে কয়েকটা ব্যাটারী সেট রেডিও গিয়েছিল। ওতে ওরা 'ভয়েস অব আমেরিকার' অনুষ্ঠান শুনতো। তাতে ওরা এই বাস্তুত্যাগের ব্যাপারটা জানতে পারে। জানতে পারে জেনেভা প্রতিশ্রুতির কথা। আমাদের ক্যাম্পে আসার পর ওরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের কার্যকলাপ দেখে শুনে যাচ্ছিল। কখনো বা আমাদের কাজে ওদের স্পষ্ট না-পছন্দের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। ওরা হয়তো ভাবছিল, "দ্যাখো, ওই নাবিকটার কাণ্ড। ডাক্তার ব্যাটা ওর নামটা কি জানি বলেছিল, ওইটা, বেকার। দ্যাখো, সে কি একটা মেশিন ঘাড়ে করে এদিক ওদিক কী সব ছড়িয়ে যাচ্ছে। ভালো, রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে না তো? লোকটা কী নির্মম পাষণ্ড!"

মোটেই তা নয়। নরম্যান বেকার ছিলো এভিয়েশান বোটসোয়াইনের মেট। তৃতীয় শ্রেণী—আমার খাতায় অবশ্য প্রথম শ্রেণী এবং তারও কিছু বেশী। আমার জন্যে ফরাসী জানা দোভাষী হিসেবে তাকে পাঠানো হয়েছিল। যিনি ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, কম্যাণ্ড'রদের মধ্যে উনিই হয়তো একমাত্র লোক, যিনি জানতেন না আমার এখানে প্রথম সারিতে আসন পাওয়ার একমাত্র কারণ আমার ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জন।

বেকার এবং আমি মিলে ঠিক করলাম, সব ব্যাপারে সোজাসুজি ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে আমরা কেউ কারও কাছে দায়ী থাকব না।

"ঠিক আছে, আমি তাহলে দোভাষীগিরি আর নাইবা করলাম।" সে সংক্ষেপে বলল, "কিন্তু অন্য কাজ কামে তো লাগাতে পারি!" মোহাজেররা ওকে ভুল বুঝেছিল। মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে বেকারই হচ্ছে হাইপণ্ডের সত্যিকার বীর।

আমার কোরম্যানরা এই মানুষগুলোর অস্বস্তি আর আশঙ্কা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিল। কোন এক সময় আমরা হয়তো রুগী দেখছি, তখন দেখা যাবে একজন বুড়ি—হয়তো কুষ্ঠ রুগী গুঁড়িমেরে, আসন পিড়ি হয়ে বসে আছে আর আমাদের কাজ-কর্ম দেখছে। ঘণ্টার পর ঘন্টা সে রুগীদের পরিস্কার করা, ইনজেকসন দেয়া, ড্রেস করা ইত্যাদি দেখছে। অনেক ক্ষণ পর বেশ একটু ইতস্বতঃ করে সে উঠে এলো। 'দাও মাত' বলে তার ছানি পড়া চোখের জন্যে দওয়াই চাইলো। তখনো হয়তো তার মনের সন্দেহ ঘোচেনি। অবশ্য আমাদের ঔষধ-পত্রের যাদুকরী শক্তিই ওদের সন্দেহ ঘোচাবার শ্রেষ্ঠ উপকরণ ছিলো। এ্যান্টিবাইসটিক, ভিটামিন সাবান আর পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতিতে যে এমন কাজ দেয়, তা আগে আমিও জানতাম না। সত্যি এসবের অমোঘ ক্রিয়া।

টীকা দেয়া আমাদের পক্ষে আরেক সমস্যা। কারণ ওদের বুঝানো হয়েছিল আমাদের ক্যাম্পে এনে ওদের টীকা দিয়ে রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়া হবে। ওদের আরো বলা হয়েছে, টংকিনবাসীদের গিনিপিগের মতো ব্যবহার করে আমরা ঔষধ-পত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি। আই-এফ-ই-ডি-ডব্লিউ-র জন্যে যে আমাদের নমুনা সংগ্রহে এতো বেগ পেতে হচ্ছিল, এটাই তার অন্যতম কারণ।

আমাদের সম্পর্কে ওরা এতই সতর্ক ছিলো যে, কখনও বা ওদের চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট তাঁবুর সামনে একদম পাওয়া যেতো না। তাই আমরা তাঁবুর সামনে গিয়ে রুগী দেখা শুরু করতাম। তখন চারপাশে অগুণতি মোহাজের ভীড় করে, গুঁড়িমেরে বসে থাকতো আর দেখতো সব কাণ্ড-কারখানা, ভাবখানা এই, "ও করতে চায় কি? .....নজর রেখো.....সাবধান .....হুঁ!"

বড় বড় মুখওয়ালা জাহাজগুলোয় চড়ে আসবার সময়ও একই কাণ্ড করেছে ওরা। 'এলারসিটি' বা 'এল, এস, এম,' গুলোর পুরবার জন্যে ওদের দরোজা খুললেই ভয়ে ওরা পিছু হটে যেতো। ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে লাউড স্পীকার নিয়ে একজন পুরোহিত ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করে চলল, ভয় পেতে মানা করল। শেষ অবধি নজীর দেখবার জন্যে কিছু সময় নিচে নেমে এসে চড়ে দেখল। তারপর মোহাজেরা ভয় বিজড়িত পদবিক্ষেপে জাহাজে চড়বার জন্যে এগিয়ে গেল।

কখনো ওদের হাতে দেখা যেতো নানা প্রচার পত্র। এসেছে সব 'যবনিকার' অন্তরাল থেকে। একেবারে ডাহা মিথ্যা সব লেখা থাকতো এতে, কিন্তু তবু.....

একটা প্রচারপত্রে আমাদের যুদ্ধজাহাজ 'ম্যারিন এডলার' করে যাত্রী পারাপারের কথা উল্লেখ আছে। সমুদ্র পীড়াগ্রস্ত মোহাজেররা রেলোর উপর পড়ে ভীষণভাবে বমি করছে আর সাদা টুপি পরা শয়তান নাবিকরা তাদের দু'হাত টেনে রেখে কেটে সাবাড় করে দিচেছ। চারদিকে ভীষণ অবস্থা!

মোহাজেরদের মধ্যে যারা এসব বাজে ওজরে বিশ্বাস করবার লোক নয়, ওরা ত আসল ব্যাপারটা সঠিক আঁচ করতে পারতো না। সহজভাবে যাদের বুদ্ধিজীবি আখ্যা দেওয়া যায়, এরকম কিছু কাঁচা বয়সী যুবক আমাকে আনবিক বোমা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতো। ওরা শুনেছিল, পারমানবিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন জেভাদা রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। তারপর বিকিনি এবং প্রশান্ত মহাসাগরের আরও কয়েকটি দ্বীপ ধ্বংশ করেছিল। পরবর্তী বিস্ফোরণ ঘটবে টংকিনে। এসব প্রশ্ন কেন করছে জিজ্ঞেস করায় ওরা একটা প্রচার-পত্র তুলে ধরল। ভিয়েৎমীন প্রচার-পত্র খানায় আকাশ থেকে তোলা ওদের পুরনো প্রিয় রাজধানী হ্যানয়ের ছবি। তাতে আনবিক ধ্বংসলীলার স্বকপোল কল্পিত তিনটি কেন্দ্র। তার উপর সবাই পড়তে পারে এমনি ভাবে লেখা শুধু একটি শব্দ—'মাই' মানে 'আমেরিকান'।

আমাদের সাদা নেভি আণ্ডারসার্টগুলোও ওদের সন্দেহের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ইউ. এস. এস. আশকারী' জাহাজে আমি একবার বক্তৃতা করেছিলাম। কিছুটা আমাকে ধন্যবাদ জানানোর ছলে, কিছুটা বা

নাবিকদের বদান্যতা দেখাবার জন্যে ওরা বিরাট এক বাক্স ভর্তি নৌবাহিনীর জন্যে সূতী জামা এবং জাঙ্গিয়া পাঠায়। মোহাজেরদের তখন এগুলোর বেশ প্রয়োজন। জামাগুলো অন্ততঃ জামা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাক্সপাঁটরা তাঁবুতে এসে পৌঁছলে মোহাজেররা চারদিকে এসে ভীড় করলো। তাদের একজনকে একটা আণ্ডার সার্ট দিলাম। হাতে নিয়ে সে ওটার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। জিনিষটার অস্তিত্বও যেন তার অনুভূত হচ্ছে না। কোনো বড়ো ষ্টোরে গিয়ে মার্কিন মহিলারা যেমন কিছু কিনতে গিয়ে খুব নেড়ে-চেড়ে দেখে, তার কিছুই সে করলো না। নিশ্চুপে হাতে ধরে রেখে আমার দিকে চেয়ে রইলো। এগুলিতে কাজ হবে না দেখে, অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করলাম। আমার পরণের খাঁকী সার্টটা খুলে ফেললাম এই জনতার সামনে। খুলে দেখালাম যে আমিও ওধরণের একটি সার্ট গায়ে দিয়ে আছি। ওতে আমার নাম আর সার্ভিস নম্বর লেখা। ঠিক যে ধরণের সার্ট ওদের দিচ্ছিলাম তাই আমার গায়ে। আমি একটু অনুরোধ করলাম। কাজ হবে এই ছিল আমার ধারণা, এবং সম্ভবত হয়েও ছিল তাতে। একজন সার্ট তুলে নিল। একজন তার নগ্ন গায়ে চড়িয়ে দিল একটা নিলামে নাইলন বিক্রির মতো। মুহূর্তে সার্টগুলো সব উধাও হয়ে যেতে লাগলো। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ! আমার গায়ের চামড়া দেখানো বৃথা যায় নি। আহা 'আশকারী' জাহাজের নাবিকরা যদি দেখতো এরা কি চমৎকার ভাবে তাদের সার্টগুলো পরছে। কেউ সামনের দিক পেছনে, পেছনের দিক সামনে। উপরের বোতাম নীচে, নীচের বোতাম উপরে লাগাতে লাগলো। মেয়েরাও পরছিল এই টি সার্টগুলো। তাদের বুকের উপর লেখা রয়েছে "২৭৮—০০—১৯ কিংবা ৩৩৯—২৭—৬১" ইত্যাদি।

মাইক এডলারের স্থলাভিষিক্ত রোগার একলী জার্মানী থেকে এসে-ছিলেন। সেখানে মোহাজের সমস্যার ভার ছিল তাঁর উপর। বেশ মোটাসোটা হাসিখুশি লোক। কাজ-কর্মে মন বসিয়ে আমাদের চারদিকে যখন টাকাপয়সা খরচের কার্পণ্য দেখলেন তখন হাসিখুশি ভাব অনেকটা উঠে গেল। একে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন, "আমেরিকান ইম্প্যাক্ট।" অনেক মোহাজেরদের চোখে প্রথম দেখা মার্কিনবাসীর নমুনা আমরা মেডিকেল ইউনিটের চারজন, তাই 'আমেরিকান ইম্প্যাক্টের' কিছু অবদান

রেখে যাবার মতো ক্ষমতা আমাদের ছিল। আমি এবং আমার সহকর্মীবৃন্দ মিলে একটা প্লান ঠিক করলাম, আমার মনে হয়, এ লাইনের কোনো এডমিরাল দেখলে বলতেন, "আমরা ব্যবহারযোগ্যনীতি জারী করতে যাচ্ছি।" আমার সহকর্মীরা চাইতো, ওরা যা কিছু করছে তা ঠিক আমেরিকার কাজ হিসেবে গণ্য হোক। তাদের প্রতিটি কাজের একটি তীব্র প্রতিক্রিয়া থেকে যাক। এমন কি ওরা যদি শিশুদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়, মেয়েদের গায়ের উপর জীপের চাকা তুলে দেয় কিংবা তাদের রাস্তায় ভীড় দেখে তীব্রভাবে হর্ণ বাজাতে থাকে তাহলে তাও আমেরিকা করছে বলে গণ্য হোক। আমরা যেখানেই যাই, এমন কি গোসল খানায় গেলেও (তাঁবুর বাঁ পাশের মাঠে) আমাদের পেছন পেছন এতো লোক ঘুরতো যে অনেক সময় ধৈর্য সম্বরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। তবু আমি এমন কাউকে দেখিনি যে এদের উপর ধৈর্য চ্যুতি প্রকাশ করেছে।

আমার সহকর্মীরা মোহাজেরদের কাজ-কর্ম করে যাচ্ছিল ধৈর্য, বোঝাপাড়া আর ভালোবাসার স্বর্ণরেণু মিশিয়ে। এটা অবশ্য বেশী রকম পরোক্ষ আবেদনের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যক্ষ আবেদনও আমাদের ছিলো। আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হলো প্রথমে ভিয়েৎমীন ভাষায় 'এটাই হোল মার্কিন সাহায্য' এই কথাগুলো দিয়ে। আমার সহকর্মী সবাই কথাগুলো শিখে ফেললো। আর একটা এ,সি,সি, দেয়া থেকে শুরু করে ছোট ছেলেদের প্যাণ্ট পারিয়ে দেয়া পর্যন্ত সব কাজে ওরা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে যেতে লাগল। বস্তুতঃ কথাগুলো আমরা এতো বেশী ব্যবহার করতাম তার বদলে মোহাজেররা কিছু চা'ল দিয়ে নতুন তাঁবু গড়ায় সাহায্য করলে কিংবা বর্ষার কাদা থেকে আমার জীপটা টেনে তুলে দিলে দাঁত বের করে চীৎকার করে বলতো, "এটাই হোল ভীয়েৎনামীজ সাহায্য।"

রোগার একলী 'মার্কিন সাহায্য' লেখা কতকগুলো চিহ্ন যোগাড় করে-ছিলেন। ওগুলো বাক্স, ঔষধের শিশি, পানির তাঁবুতে লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। চারদিকে শুধু সেই অভিশপ্ত 'নৌক মীর' (ভিয়েৎনামীজ ভাষায় মার্কিন সাহায্য) ক্ষুধিত পাষাণ! এতে অবশ্য একথা বলা যায় না যে, আমরা বেশ জবরদস্ত শিক্ষামূলক কিছু করবার জন্যে উঠে পড়ে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলাম। বরঞ্চ আমি বিশ্রাম করি, আমাদের ব্যবসায়ীসুলভ মনোবৃত্তি

পুরোমাত্রায় জোর ছিলো। প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শবাদীদের সঙ্গে তখন আমাদের যুদ্ধ। এবং বন্দুক আর হাইড্রোজেন বোমা কোনোটা দিয়ে নয়। উন্নততর জীবন যাত্রার অনুসন্ধানে রত এমন সব জাগ্রত আত্মার জন্যে ওদের প্রতিযোগীতা। তাই আমাদের ভালো রকমে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছিল যে আমাদের জীবন যাত্রার অনেক গুণ রয়েছে মহৎ দিক। প্রতিষেধক ঔষধ ইউনিটের কর্মীরা এটা বুঝতে পেরেছিল। এবং সাধ্যমত ওরা করে যাচ্ছিল। তাদের আমি অভিবাদন জানাই।

কম্যুনিষ্ট রাজধানী হ্যনয় থেকে রাতে যে আকাশ বাণী প্রচার করা হতো, তার নাম 'ভয়েস অব ভিয়েৎনাম' একটা অনুষ্ঠানের কথা আমার মনে আছে। ঐ এলাকার চাষাভূষোদের জন্যে তথাকথিত 'শিল্প ও সাহিত্য অনুষ্ঠান' বিষয় ছিল—'একজন আমেরিকান" আমি অবিকল কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"ওর মাথাটা হলো একটা কঠোর দুর্গ। ওর দাড়ি কাঁটা-তারের বেড়া। চোখ দু'টো বোমা, দাঁতগুলো বুলেট। ওর দু'বাহু দু'টি বন্দুক। নাক দিয়ে বেরোয় অগ্নিশিখা। রক্ত শোষক পিশাচ সে। শিশুদের রক্তপান তার মজ্জাগত। তার ললাট হলো অস্ত্রাগার। শরীরটা হলো যুদ্ধক্ষেত্র। আঙুল হল বেয়নেট আর পায়ের পাতা হল ট্যাঙ্ক। ভয় দেখবার জন্যে সে থাবা বাড়ায়, সে তার বিকট মুখের ভিতর লোহা চিবোতে পারে। কারণ তার বিরুদ্ধে বীর-বিক্রমে যুদ্ধরত আমাদের শক্তিশালী 'ভিয়েৎমীন' বাহিনী। সব দিক বিচার করে দেখা যাবে এই আমেরিকান হল একজন কাগুজে দৈত্য।"

'ওহে, তোমরা যারা তুকসন, কেনোসা আর ডেসমইনসে রয়েছে। এই বিবরণ থেকে নিজেদের চিনতে পারছো কি? ইতিমধ্যে তাজা বাচ্চা-টাচ্চা খেয়েছো কি?

ভাগ্যিস্, মোহাজেরদের কাছে কোনো বেড়িও ছিল না। তাই ওরা এই বিশেষ বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পেতো না। শুনলেও যে ওরা বিশ্বাস করতো, তা মনে হয় না। কেননা, বেকারের মাথা কঠোর দুর্গের মতো দেখতো না। সে নিজেও যেমন, দেখাতোও তেমনি একটা সঙের মতন। আমার নাক দিয়ে কোনো অগ্নিশিখা বেরতো না। আর রিপাব্লিকানরা নির্বাচিত হলে পর মেডিকেল ইউনিটের বাকী সবাই 'ছোট শিশুদের রক্তপান' ছেড়ে দিয়েছিলো।

ভিয়েৎমীনদের প্রচারণা জেনেভা চুক্তি অনুসারে গঠিত 'আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা' বিচলিত করে তুলেছিল। মোহাজেরদের ক্ষতি সাধনের জন্যে আমরা যে এটা-সেটা করছি বলে কম্যুনিষ্টরা দাবী জানাচ্ছিল তা প্রমাণ করার জন্যে কমিটির সদস্যরা ঘন-ঘন আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শন করতে লাগলেন। প্রথমে ওরা তদন্ত শুরু করলেন, আমরা নাকি পানির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছি (ব্যাপারটা এড মৌগ্রেকে বোবা করে ফেলে) আর আমরা নাকি এমন সব পাউডার স্প্রে করছি যাতে মোহাজেররা বন্ধ্যা কিংবা নপুংসক হয়ে পড়ছে। সে ব্যাপারেও ওরা তদন্ত করলেন। বলাবাহুল্য আমরা স্প্রে করছিলাম ডি-ডি টি আর তাতে হয়তো ওদের শরীরের উকুনগুলো সত্যি বন্ধ্যা হয়ে পড়ছিল।

তার উপর আছে সেই পুরনো ধুয়া—মার্কিন আর ফরাসীরা মিলে জোর করে ওদের দেশবাসীকে টংকিন ত্যাগে বাধ্য করছে। আমরা নাকি ওদের চুরি করে নিয়ে আসছি। উনিশ শো চুয়ান্ন সালের নভেম্বরে ভিয়েৎনাম নিউজ এজেন্সীর বেতারবার্তা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের দালালরা অবরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। হাইপঙ এলাকা থেকে লোকজন চুরি করে তাদের দক্ষিণ ভিয়েৎনামে চালান দিচ্ছে। গতরাত ন'টার সময় ওরা ডু হাঙ্গ ষ্ট্রীটে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আর পুলিশের দালাল দিয়ে ঘেরাও করে এবং পঞ্চাশজন যুবককে ধরে নিয়ে যায়। নির্লজ্জভাবে ওরা ঘোষণা করে, এই যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে নতুবা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রবার কৃষি কেন্দ্রে কাজ করতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।"

"পাঁচদিনে সাম্রাজ্যবাদী দালালরা একশো সতেরো জন পেডিক্যাব ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে দক্ষিণে চালান দিয়েছে। তখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ তালিকায় জানা গেছে, গত একমাসে একুশটি অবরোধের ফলে হাইপঙ থেকে একশো পঞ্চান্নটি লোক ওরা ধরে নিয়ে গেছে।"

"একই সময়ে কিয়েন আনে তিনটি অবরোধ হয় এবং নিরানব্বুই জন লোক গ্রেপ্তার হয়। কোয়াং এয়েন থেকেও এভাবে অবরোধ করে অনেক লোককে ওরা বলী করেছে। হাইপঙ এবং অন্যান্য এলাকার ভিয়েৎমীনরা তাদের এই ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

জানায় এবং জেনেভা চুক্তির অবসানকারী এসব অবরোধ, জোর করে লোক ধরে নেয়। দেশত্যাগে বাধ্য করা প্রভৃতি কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করবার দাবী জানায়।"

হাইপঙে অবরোধ, হাঙ্গামা অনেক হয়েছিল—সত্যি কথা। কিন্তু কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিশ্বাস করুন, আসল ব্যাপারটাই ছিলো অন্যরকম। দিনে চৌদ্দ পনেরো ঘণ্টা রোগী দেখে প্রতি রাত্রেই দেখেছি, বাস্তুত্যাগের ঝামেলাটা যদি বন্ধ হয়ে যেতো, কী মজাই না হোতো! বিরক্তি ধরে গিয়েছিল আমার। আমি যদি সাম্রাজ্যবাদীও হতাম (রাশিয়া যেমন দিনে দিনে বাইরের দিকে বাড়ছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী হবার প্রবৃত্তি কি কারু আছে আজকাল?) তবু তা চাইতাম না। শ্রান্তি, ক্লান্তিতে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, আমার মনে হয় এবং বলতে গেলে এটা গেলে ওটা নিজের কাছে কেমন আশ্চর্য শোনায় যে এই গুরু দায়িত্বটা যতোই বাড়ছিল ততোই যেন আমি তা উপভোগ করছিলাম। সুদীর্ঘ সাঁতারের পর সাঁতারুর যেমন শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, অঙ্গ অবশ হয়ে আসে তবু সে একটা তীব্র আনন্দ উপভোগ করে, আমি যেন তেমনি আনন্দ উপভোগ করছিলাম।

আমার মনে শুধু ভয় হচ্ছিল, নতুন কেউ আসলে, তিনি যতো উপযুক্তই হোন না কেন, এখানে যা হচ্ছে তা তাঁর পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে আর মোহাজেরদের আমি যে দৃষ্টিতে দেখছি সে দৃষ্টিতে দেখা তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। নিজেকে আমি শুধোলাম, ময়লা কাপড়, ঘা, পাঁচড়া আর দুর্গন্ধময় পরিবেশ থেকেও আমি যে ভাবে ভিয়েৎনামের আত্মাকে খুঁজে বের করছি, অন্যে কি তা পারে? তাই বাইরে থেকে নানা চাপে পড়ে নৌবাহিনী থেকে যে সব আদেশ আসতো মনের তাগিদে আমি তার অদল-বদল করে কাজ সমাপ্ত করতাম।

বারবার আমি ফরাসী কিংবা সেই মার্কিন অফিসার দু'জনের কাছে যেতাম কিছু না কিছু নালিশ নিয়ে। এতে আমার ঘাড়ে বোঝা আরো বাড়ল। যেমন ধরুন, এক সময় আমার মনে হলো চাউলের পরিবেশন যথা বিহিত হচ্ছেনা। আমি গরম হয়ে গিয়ে বললাম, "একজনের ভার আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি নিজেই দেখব।" এক কথায় কাজ হয়ে গেল। এরপর থেকে চাউল রেশনের ব্যবস্থা আমাকে করতে হল।

কিন্তু আগেই আমি বলছি, একথা সত্য যে, হাইপঙ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা তার কাছাকাছি কিছু একটা হয়েছিল। প্রথমে ছোট এয়ার মোটর ডি-ডি-টি ডাষ্টিং মেশিনগুলো বসাবার সময় এরকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। এই কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এড গ্লিজন। তাঁর কোরম্যানদের পরিচালিত করার জন্যে তাঁর হাতে ছিল একটা 'ডাষ্টিং-গান।' আরও দু'টি ডাষ্টিং বন্দুক সহ তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর কোরম্যান। মোহাজেরা যাতে ডি-ডি-টি ছড়ানো পথের উপর দিয়ে যায়। এজন্যে ভালো করে ডি-ডি-টি ছড়িয়ে মহামারি প্রতিরোধই ছিলো তাঁদের অভিপ্রায়। মোহাজেরদের প্রথম দলে ছিল ছোট ছেলে-মেয়ে। ওরা যখন এডের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এড তখন তাঁর বন্দুকের ট্রিগারে টিপ দিলেন। সাদা ধলোয় শিশুদের চারদিক ভরে উঠল। মায়েরা আসছিলো ওদের পিছু পিছু। ওদের কাঁধে বিরাট একটা করে ঝুলি। ওর ভারে ওরা নুয়ে পড়ছিল। মার্কিন সাহেবের কাণ্ড দেখে (মার্কিনদের এরকম নৃশংসতার কথা আগে অনেক শুনেছে।) সব কিছু ছুঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার তখন বেদম হাসি পাচ্ছিল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আমি হাসতে লাগলাম। একটা কি দু'টি ঘুষি মেরে এড নিজকে ছাড়িয়ে নিতে সমর্থ হন। পরে প্রধান মান্দারিন এবং অন্যান্যরা এসে গণ্ডগোল থামায়। এড রেগে-মেগে মনুষ্যজাতির কল্যাণকারী এই পাউডারগুলো তাঁর সহকর্মীদের দিকে ছুঁড়তে শুরু করে। ওরা অবশ্য তাঁর দিকে ছোড়ে নি।

এই সংযত হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত লোকগুলোর হাতে বেকার এবং আমিও কিছু উত্তম মধ্যম খেয়েছিলাম। তাও একেবারে ফেলনা নয়। কিন্তু প্রাচ্যের এই মুখগুলোর আসল অবস্থা আমার জানা ছিল বলে আমি চেপে গেলাম। আমরা কোথায়, কী পরিবেশে যাচ্ছি সে কথা সব সময় গভীরভাবে মনে রাখতাম।

একটি মেয়ে একদিন আমার কাছে এল একটি শিশু নিয়ে। সারা গায়ে তার ক্ষত (আলসার)। ইঅ আর ক্ষতের অব্যর্থ প্রতিষেধক হল পেনিসিলিন। এ চিকিৎসা এখন নিত্য-নৈমিত্তিকে পরিণত হয়েছে।

শিশুটির নিতম্বে একটা ইনজেকশন দিয়ে তার মাকে বললাম, পরদিন নিয়ে আসতে।

কয়েক ঘণ্টা পর। বাইরে ভীষণ গালি আর চীৎকার শুনলাম। চেয়ে দেখি, সে মেয়েটিই তার শিশুটি সহ একটি লোক নিয়ে আসছে। এই তো প্রমাণ, আমি একজন মার্কিন দানব! শিশুটি তার চর্মরোগের জ্বালায় অস্থির। তাই নির্দোষ পেনিসিলিন দেয়াতেও সে কেঁদে কুটে সারা! ওর মা'টিও এতো রেগে গিয়েছিল যে, কিছু বলতে পারছিল না। শিশুটিকে পাশে দাঁড়ানো লোকটির হাতে তুলে দিল। লোকটি তার লাঠিটি চেপে ধরে আরো দশ বিশ জন ডেকে নিল। বেকার এসে যখন আমাকে উদ্ধার করল, তখন ওদের কয়েকটাকে আমি আহত করে ছেড়েছি।

পরদিন সমস্ত ক্যাম্প পরিদর্শন করে আমি একা এবং নিরস্ত্রে সেই মেয়েটির তাঁবুর দিকে গেলাম। যা আশা করেছিলাম, তাই হল। ঘা এখন অনেক শুকিয়ে এসেছে। মেয়েটি চোখের জলে সারা হয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মাফ চাইল। কয়েক হপ্তা সে ক্যাম্পে ছিল। আর রুগী দেখার সময় আমাকে সাহায্য করতো। আর যখন তখন তার পরিস্কার সুন্দর শিশুটিকে দেখাতে চাইতো। মোহাজেরদের উপর এর প্রভাব পাঁজর ভাঙ্গার সমান।

মুক্ত এলাকা বেয়ে জলপথে যেসব মোহাজের আসতো ফরাসী নৌবাহিনী সব সময় তাদের খোঁজে সচেতন থাকতো। তাদের পেট্রল ক্র্যাফ্‌ট আর একটি সী-প্লেন সব সময় সাম্পানের খোঁজে তল্লাশী চালিয়ে যেতো। দেখে মনে হবে বুঝি নতুন কোনো বন্দরের খোঁজ চলছে!

গোড়ার দিকে মোহাজেররা নদীর শাখা উপশাখা বেয়ে সোজা চলে আসতো হাইপঙে। কিন্তু 'ভিয়েৎমীন'দের কড়া নিয়ন্ত্রণ শুরু হতে এটা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই সাহসী লোকরা সম্পান বেয়ে পাড়ি জমাতো। সাম্পানগুলো এতো হাল্কা ছিল যে, দক্ষিণ চীন সমুদ্রের হাওয়া সইবার ক্ষমতা ওদের ছিল না।

এই বিশেষ কাজে নিয়োজিত ছিলেন ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জিরাল্ড কাউবিন। সব সময় তিনি তার কাজের খতিয়ান জানাতেন আমাদের। এতে আমি খুব উপকৃত হতাম। সামনে কী ঘটবে তার পূর্বাভাষ পেয়ে সাবধান হবার সুযোগ পেতাম।

একদিন ভোরবেলা কাউবিন আমাদের ক্যাম্পে একজন লোক পাঠালেন। আমি যেন তার সঙ্গে ফরাসী নৌবাহিনীর জেটিতে গিয়ে হাজির হই। তিনি বলে পাঠিয়েছিলেন যে বেতার বার্তায় তিনি খবর পেয়েছেন, বৈদ্য এলঙে চৌদ্দটি চীনা পোত দেখা যাচ্ছে। কাউবিন ওদিকে একটি এল, এস, এম, ফরাসী পোত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চীনা পোতগুলোকে হাইপঙে নিয়ে যাবার জন্যে। আমিও ক্যাম্পে খবর দিয়ে রাখলাম অন্ততঃ পাঁচশো কিংবা তার কাছাকাছি অসুস্থ লোক (আসলে সেখানে এগারো শ'য়ের উপর লোক ছিল) আমাদের অতিথি হচ্ছে। তারপর কাউবিন আর আমি এল, এস, এম, খানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চার ঘন্টা নদীপথ বেয়ে উপসাগরে এসে পৌঁছলাম। মোহাজেরদের তল্লাশীর জন্যে যে সী-প্লেন খানা গিয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে হাইপঙে ফিরে এসেছে।

ঠিক দুপুরের দিকে আমরা উপসাগরে এসে পৌঁছলাম। চারদিকে নিস্তব্ধ, নিথর। দু'দিকে ধূসর পাথরের পাহাড়। কোথাও গাছ পালার

চিহ্ন অবধি নেই। পানির বুক ছুঁয়ে বড় বড় চূর্ণস্তম্ভের মতো পাথরের পাহাড়গুলো আকাশ চুম্বী হয়েছে।

সম্পানগুলো উপসাগর বেয়ে আসছিল। কোনোটা পাশা-পাশি, কোনোটা পিছু-পিছু। একটার পর একটা। একটু কাছে এগিয়ে এলে, চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। স্বচ্ছ পানির উপর স্পষ্ট দিবালোকে সমস্ত দৃশ্যটা যেন কোনো রূপকথার বইয়ের পরীর দেশের দৃশ্য ; কিন্তু আমরা যা দেখেছি তা একান্তই বাস্তব আর গল্পের বইয়েও তা অচিন্ত্যনীয়।

এই চৌদ্দটি সাম্পানে উন্মত্ত দক্ষিণ চীন সমুদ্র পেরিয়ে এক হাজারের উপর মোহাজের ঠেসাঠেসি করে আসছিল। সমস্ত বিপদ-আপদ মাথায় নিয়ে মাছ ধরার নৌকোগুলো করে এই অসম্ভবকেও ওরা সম্ভব করেছিল সেদিন। তখন মাথার উপর প্রখর সূর্য। তবুও ওরা সবাই আধ ভেজা। ঠাণ্ডাও লেগেছে অনেকের। অনেকে সমুদ্র পীড়ায়ও আক্রান্ত হয়েছে। বমি করে পেটও খালি। দূর থেকেও বেশ বোঝা যায়, রাতের ঠাণ্ডায় শিরা গ্রন্থী জমাট হয়ে গেছে। ব্যথা বেদনায় ভুগছে ওরা। অন্য কাউকে সাহায্য করবার জন্যে কেউ কেউ সাম্পানে হাঁটা-হাঁটি করছিল। কিন্তু বিপুল জনতার বাকি সবাই কাঠের পাটাতনে নির্জীবের মতো বসে আছে।

শ্লথগতি ছায়াছবির মতো ওরা এগিয়ে আসছিল। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা লবন-জলে থেকে ওদের চামড়া বেশ শুকিয়ে গিয়েছে। সূর্য-কিরণে তা ফেটে যাচ্ছিল। প্রায় সর্বক্ষণ ওদের পায়ের নীচে পানি জমা থাকতো। তাই পায়ের গোড়ালিও অনেকের ফুলে গিয়েছে। কাছে ভিড়বার আগেই ওদের দুরবস্থা অনেকটা আন্দাজ করতে পারছিলাম।

আমাদের এল, এস, এম, খানা মোহাজেরদের কাছে এগিয়ে এল। আমাদের পেছনে একখানা ফরাসী পতাকা তুলে দেবার সময় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল। শত্রু নয় মিত্র জেনে ওদের ভাসা মাস্তুলে এক ভেজা নিশান উড়িয়ে দিল ওরা। বছরের পর বছর ধরে এ পতাকা ওরা গোপনে রেখে দিয়েছিল। এ তাদের কুল-চিহ্ন, তাদের জাতীয় নিশান।

সবচেয়ে উঁচু মাস্তুলে উড়িয়ে দিল পোপের ধ্বজা। হলুদ আর সোনালী রঙের নিশান। মাঝখানে পোপের ত্রিমুখী তাজ আর সেণ্টপিটারের চাবি।

কাছে এগিয়ে এলে এল, এস, এম-এর সুন্দর বিস্তৃণ ডেকে তুলে নেবার জন্যে ফরাসীরা হাত বাড়িয়ে দিলো। বহু সংখ্যক মোহাজের উঠে এলো আমাদের জাহাজে। শক্ত সমর্থ কিছু লোক শুধু রয়ে গেল সাম্পানের উপর। পাশা-পাশি আমরা এগিয়ে চললাম। এগিয়ে চললাম হাইপঙের পথে। মোহাজেরদের আমরা চা, পানি আর ফরাসী রুটী খেতে দিলাম। এতো লোকের তুলনায় খাদ্যদ্রব্য ছিলো কম। কিন্তু তাতেও কাজ দিলো। দু'ডজন ক্রুর এল, এস, এমে, খব বেশী খাবার বইয়ে আনা যায় না। এক'শ বস্তা চাল আনার যে ইচ্ছে ছিল আমার, তা আর এখন বলে কি হবে!

কাউবিন আর আমি বেশ বয়স্ক ধরণের কয়েকজন মাতব্বর বেছে নিলাম। নিয়ে গেলাম ওদের কেবিনে। শুধোলাম, "তোমরা আসছ কোথেকে? তোমাদের গ্রামে কেমন ছিলে? চলে আসছ কেন? তোমরা কে?"

শ্রান্ত, বিষাদ-ক্লিষ্ট কণ্ঠে ওরা ওদের কাহিনী বলে গেল। এরকম গল্প হামেশাই আমরা মোহাজেরদের কাছ থেকে শুনেছি। তবে সচারাচর যা শুনি তা থেকে কিছুটা মর্মস্পর্শী এবার। পরিকল্পনা করেই ওরা বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে বাস্তু ত্যাগ করেছেন। দু'টো সনাতন অস্ত্র ওদের সহায় : ইমান আর আশা।

আজকের এই মুহূর্তে আমি হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছি, পেরিয়ে এসেছি শত সহস্র মুহূর্ত। তবু সেদিনের সেই মুহূর্তের প্রতিটি কথা আমি মনে করতে পারি। এবড়ো খেবড়ো মুখ-ওয়ালা বুড়ো-গুলো আমাদের সামনে বসে কড়া চা গিলছিল আর নরোম গলায় বিনাদ্বিধায় বলে যাচ্ছিল :

"কুয়া লো আমাদের গাঁয়ের নাম। সে এখান থেকে তিন শো কিলোমিটার দক্ষিণে। সমুদ্রের উপকূলে আমাদের গ্রাম। সোনার গাঁ ছিলো আমাদের। অসংখ্য ছোটো ছোটো ধানের খেতে গাঁয়ের চারদিকের সমান্তরাল ভূমি ভরপুর। কোথাও ধানচারা আশ্চর্য সবুজ হয়ে রয়েছে। মৌসুমী ঋতুর ঘন ধূসর আবহাওয়ায় আকাশ কালো মেঘে ভরে ওঠে, গ্রীষ্মকালে সূর্যালোকের প্রখর দীপ্তি চারদিকে উদ্ভাসিত করে রাখে। তখন আকাশে থাকে অপরূপ নীলচে রঙ। সারাদিন দেখবে গাঁয়ের লোক

কাজ করছে। শস্য ক্ষেতে পানি দিচ্ছে। লাল মাটির কাদায় জোর দিয়ে লাঙল ঠেলছে।

"গাঁয়ে কিছু জেলেও রয়েছে। এই যে সাম্পানগুলোয় চড়ে আমরা এলাম, এগুলো ওদের। ওগুলো বেশ শক্ত। দু'টো মাস্তুল আর ক'টি তেল-চটা দাঁড়। অবশ্য নেহাত সাদাসিধে ভাবে তৈরী, সমুদ্রে চালাবার উপযোগী নয়।

"উনিশ শো একান্ন সনে আমাদের শত্রুরা আমাদের শাসক বনে। ওরা নতুন আইন কানুন নতুন ইতিহাস, নতুন জীবন ধারার প্রবর্তন করে। চালু করে সাম্যবাদী জীবনধারা। অবশ্য কম্যুনিষ্টরা বলে, এই নাকি ভিয়েৎমীন জাতীয়তাবাদ। এ এক রকমের অনিশ্চিত শান্তি! মান্দারিন হিসেবে আমরা বুদ্ধিমান বলে পরিচিত। আমাদের কাছেও এ এক ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার।

"ফরাসীদের সঙ্গে বিজড়িত সব ব্যাপারই কলঙ্কের কালিমা জড়িত হয়ে গেল তখন। আমাদের নতুন ঐতিহাসিকদের চোখে সাদা চামড়ার প্রতিটি কাজই খারাপ বলে বিবেচিত হলো। নিছক স্বার্থহীনভাবে যে সব ভালো কাজ ওরা করেছে সেগুলোও রাতারাতি মন্দ কাজ হয়ে গেল।

"একথা একান্ত সত্য, ভিয়েৎনামে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেছিল ফরাসীরাই। মহামারী প্রতিরোধক অভিযান পরিচালনা করেছিল ওরাই। কিন্তু আমাদের বলা হলো, ওরা শুধু সুস্থ কুলী আর স্বাস্থ্যবান দাস সংগ্রহের জন্যে নাকি ও সব করেছিল।

"আমাদের নতুন জীবন-ধারায় অনেক কল্পিত সুখের কথা বলা হল। কিন্তু আমরা শীগগিরই দেখতে পেলাম যে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের সুখের জন্যে আমাদের নির্মমভাবে স্বার্থ ত্যাগ করে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।

"নতুন ভূমি সংস্কার শুধু দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করল। জঠরের জ্বালা এখনো আমাদের জনসাধারণ ভুলতে পারেনি। ওদের 'বস্তুবাদ' রাক্ষসের মতো আমাদের দেলকে শুষ্ক করে তুলল। প্রথম দিকে ভিয়েৎমীন জাতীয়তাবাদের দলে ন্যায় বিচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু পরে মিথ্যার বেসাতিতে আসল রূপ দেখা গেল। নতুন সমাজ বিজ্ঞান, পারিবারিক নিন্দাবাদ, আত্মসমালোচনা আর অবিশ্বাসের জয়গানে মুখর

হল। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের গাঁয়ের লোক অসহায় ভাবে আত্মবিসর্জন দিল। এরকম মর্মান্তিক অত্যাচার আর কখনো ঘটেনি।

"আমাদের সবার মনে এক চিন্তা—বাস্তুত্যাগ। তাই হপ্তার পর হপ্তা ধরে আমরা প্রস্তুতি নিলাম। প্রতিদিন আমরা কিছু কিছু চা'ল সরাতে লাগলাম। বাস্তুত্যাগের কথা কোথাও খোলাখুলি বলতাম না। সোজাসুজি কিছু করতামও না। যা করতাম সব গোপনে। গাঁয়ের শাসনভার ছিল আমাদেরই এক বন্ধু মান্দারিনের হাতে। সে এখন ভিয়েৎমীন কমিশার—। নতুন বিশ্বাসের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সে এখন চরম নিষ্ঠুর সেজেছে। হাটে-ঘাটে সবখানে তার গুপ্তচর নিয়োগ করেছে।

"কয়েক বার ঠিকঠাক করেও আমরা কোনো সভা ডাকতে পারলাম না। নতুন আইনে চার জনের বেশী লোক জমায়েত নিষিদ্ধ। ধান ক্ষেতে যখন ঘাড় নিচু করে কাজ করতাম, তখন আমরা আসল কথা বলে ফেলতাম। জেলেরা মাছ চালবার সময় বলে দিতো আর মেয়েরা বাজার করতে এলেই খবর দেয়া হতো।

"এমনি করে আমাদের পরিকল্পনা আর প্রার্থনা চরমে উঠল। সে রাত এলো। আকাশে চাঁদ ছিলো না। থমথমে আঁধার! সমুদ্রআশ্চর্য-শান্ত সেদিন। রাত এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত একা কিংবা দু'জনে মিলে নিশ্চুপে সাম্পানে উঠতে লাগলাম। ঠিক এসময় মাইভন থিন বলে একটা ছেলে খুব চড়া গলায় গান গাইছিল। তাতে গ্রামের এক প্রান্তে বেশ গোলমাল শুরু হয়। পুলিশ, কমিশার আর অনেক সৈন্যসামন্ত ছুটে এলো ব্যাপার কি দেখবার জন্যে। এরমধ্যে আমাদের সাম্পানগুলো ভর্তি হয়ে গেল।

"এই পোতগুলোর একটাতে পঁচিশ জন লোক ধরে। সে-রাতে আমরা একটাতে এক'শ জনের মতো চড়ি। রাত্রির নিঃস্তব্দতার মতো চুপিচুপি আমরা তীর ছেড়ে দক্ষিণ চীনা সমুদ্রের দিকে পাড়ি দিলাম।

"হ্যাঁ, সফলতার সাথে আমরা বাস্তু ত্যাগ করেছি। অবশ্য এর জন্যে আমরা খুব খুশী হতে পারিনি। মাইর জন্য আমরা সর্বক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলাম। কোনো না কোনো সময়ে আমাদের সঙ্গে তার যোগসূত্র বেরিয়ে পড়বে তখন তার কী হবে!

"মাইর বাবা-মা মারা গিয়েছিলো যুদ্ধে। আর উনিশ শো তিপ্পান্ন সনে তার একমাত্র ভাই ছামকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়। কারণ সে ছিলো ক্রীশ্চান খুব আন্দোলনের অধিনায়ক। উনিশ শো তিপ্পান্ন সনের ঘোলোই জানুয়ারী বিকেল বেলা। শক্ত করে তাকে এক গাছের সঙ্গে বেঁধে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেদম প্রহার করা হয়। তারপর তার রক্তাক্ত দেহে গ্যাসোলিন মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। পুড়ে মেরে ফেলা হল ছেলেটাকে।

"পাল খাটিয়ে, দাঁড় বেয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারলাম আমরা এগিয়ে চললাম সমুদ্রের পানে। আর তিনটি মাইল পেরুলেই আমরা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্রে এসে পড়ব। এই তিনটি মাইল পেরুবার জন্যে আমাদের সে কী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা! সকালে উঠে কোনো তীরের চিহ্ন দেখলাম না। একটু স্বস্তিবোধ করলাম সবাই। স্বস্তি শুধু এক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি বলে। এখন নতুন বিপদ আমাদের সামনে। দুরন্ত সমুদ্রের সাথে সংগ্রাম এবার!

"উত্তর দিক বেয়ে আমরা চলতে চাইলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দিগদর্শন যন্ত্র ছিল না। নৌ বিদ্যার ভালো জ্ঞানও কারো নেই। কী আর করা, সূর্যকে ডানহাতি রেখে আমরা এগিয়ে গেলাম হাইপঙের দিকে। আমরা জানতাম, হাইপঙে ফরাসী আর মার্কিনীরা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওরা আমাদের সাইগন অবধি পৌঁছে দেবে।

"সুদীর্ঘ পাঁচটি দিন জলে আমরা এভাবে কাটালাম। আগুন জ্বালতে পারিনি আমরা। কারণ লাকড়ী সব ভেজা। চাল ভেজাই খেতে বাধ্য হলাম। অসুখ বাড়াবার জন্যে তার সাথে লবণগোলা জলে ঠাণ্ডা চা। খাওয়ার পানি কারু কাছে কিছু ছিল, কারু কাছে নেই-ই। প্রতিটি ঢেউয়ে নড়বড় করছিল আমাদের গাল্পান। সে এক ভীষণ অসহায় অবস্থা ফেলে এসেছি আমরা।

"ভোর সকালে নিজেদের এখানে দেখে আমরা চমকে উঠলাম। বুঝলাম, আমরা পিকথার বৈ দ্য এলডে এসে পড়েছি। তারপর আপনাদের সী প্লেন দেখে নিশ্চিত হলাম। এখন আমরা আজাদ—…"

শান্ত কণ্ঠে মান্দারিনরা তাদের কাহিনী বলে গেল। বাচবার আশায় মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা আমরা সাগ্রহে শুনলাম। দৃশ্যটা কল্পনা করতে গা আমার শিউরে উঠল।

ঠিক তখুনি এল্ এস এমের ডেক থেকে মৃদু স্তোত্র ভেসে এল কানে। মোহাজেররা গান গাইছে। ডেকে এসে শুনলাম। ভিয়েৎমীন ভাষার প্রতিটি কথা আমি বুঝতে পারিনি। মান্দারিনরাও তখন সুর ধরেছে। পরে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে দিলে আমাদের জন্যে।

জীবনের এক মহাসংকট পেরিয়ে এসে ওরা খোদার কাছে শুক্‌রিয়া জানাচ্ছে। ওরা গাইছে: "হে প্রভু, তোমার আরশের সৌন্দর্য আমরা ভালোবাসি; ভালোবাসি তোমার মহত্বের অধিষ্ঠান ভূমিকে। তোমায় প্রণতি জানিয়ে দিনগুলো আমাদের শান্তিতে কাটুক, এই শুধু আমাদের কাম্য।"

ভিয়েৎনামের টংকিন এলাকার বন্দর এই হাইপঙ। টাওয়ার অব ব্যাবেলের মতো এখানেও শোনা যেতো নানা ভাষার কথা। খুব বেশী না হলেও ফরাসী সৈন্য রয়েছে এখনো। আমরা স্বল্পসংখ্যক মার্কিনবাসীও রয়েছি। গলাবাজিতে আমরা অবশ্য অন্য সবার উপরে। ক্যাথলিক মিশনের পরিচালক ফাদার ফেলিস, ফাদার লোপেজ আর তাঁদের সহকারীবৃন্দ এসেছিলেন ফিলিপাইন থেকে। তাঁদের ভাষা ছিল স্পেনিশ।

তার উপর রয়েছে তিনজন সদস্য বিশিষ্ট ইণ্টার ন্যাশনেল কণ্ট্রোল কমিশন। সদস্যদের একজন হচ্ছেন কানাডা থেকে, একজন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র পোলাণ্ড থেকে এবং বাকি জন হলেন নিরপেক্ষ গণ্য করা হয় ভারত থেকে। একদা ষোলো জন লোকের একটা দলে আমি ইংরেজি, ফরাসী, ভিয়েৎনামীজ, ভারতীয়, পোলিশ, শিখ আর জার্মান ভাষা বলাবলি করতে শুনেছিলাম। ফাদার ফেলিস সেখানে ছিলেন না তাই স্পেনিশ ভাষা সেদিন শুনতে পাইনি।

উনিশ 'শ চুয়ান্নর জুলাইতে জেনেভা চুক্তির স্বাক্ষর দাতারা 'ইণ্টার ন্যাশনেল কণ্ট্রোল কমিশন' বসায়। এর লম্বা শিরোনামা সাধারণতঃ সংক্ষেপে ব্যবহৃত হতো সি-আই-সি বলে। এই কমিশনের উপর দায়িত্ব অর্পিত ছিলো যে, পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে ইন্দোচীনের সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করে জেনেভায় গিয়ে রিপোর্ট দাখিল করবে। মর্মান্তিক ভাবে খণ্ডিত ভিয়েৎনামের দু'অংশে নজর রাখা এই কমিশনের কাজ। তাছাড়া লাওস এবং কম্বোডিয়ায়ও তথ্যানুসন্ধান করবে। এর হাতে কোনো পুলিশী শক্তি ছিল না, ছিল না সামরিক শক্তি। কিন্তু (অন্ততঃ কাগজে কলমে) এর উপর উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ রাজনৈতিক সম্মান আরোপিত ছিল।

কমিশন সাইগন, হ্যনয়, কম্বোডিয়া আর লাওসের রাজধানী এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে কয়েকটা নির্দিষ্ট

দল নিযুক্ত করেছিল। তার উপর এর কয়েকটা ভ্রাম্যমান দল ছিল, যারা দু'পক্ষে গিয়ে জেনেভা চুক্তির শর্তাবলী ঠিক মতো প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা দেখে শুনে বেড়াতো। উনিশ 'শ ছাপান্নতে ভিয়েৎনামের যে গণভোট হবার কথা, তার পরিচালন ভারও এই সি-আই-সি এর উপর ন্যস্ত। এই পরিকল্পনা মতো উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিবাসীদের দুই কোটি বিশ লক্ষ ভোটে নির্দ্ধারিত হবে ভিয়েৎনাম বিভক্ত থাকবে, না অবিভক্ত হবে। ওরাই নির্দ্ধারিত করবে কোন্ ধরণের শাসন ব্যবস্থা ওদের পছন্দ। উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষে এক কোটি ভোট যে তাদের কম্যুনিষ্ট শাসনে থাকার রায় দান করবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কেন না কম্যুনিষ্ট কর্তারা সে ব্যাপারে বেশ মনোযোগী ছিলেন। আর দক্ষিণের লোকদের ব্যাপারে বলতে গেলে সে অন্য ইতিহাস।

আইনতঃ কেউ কমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, তার সে অধিকার ছিল। সুতরাং কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কারু কোন অভিযোগ থাকলে তা এই আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের সামনে পেশ করতে পারতো।

ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে করবার মতো অনেক কিছু এদের দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারেনি। কমিশন কয়েক দিন থেকে খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সব মোহাজের দক্ষিণে যাবার জন্যে বাস্তুত্যাগ করছিল, তাদের সাহায্য করবার বেলায় এঁদের কার্যক্রম ছিল একেবারে নগণ্য।

কমিশনের প্রতি ভিয়েৎমীন কম্যুনিষ্টদের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কেন না এতে করে ওরা বিশ্ব-জনমতের কাছে তাদের আজি পেশের একটা মওকা পেল। অবশ্য বিশ্ব-জনমত জানতো যে প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কম্যুনিষ্টরা টংকিনবাসীদের মোহাজেররূপে বাস্তুত্যাগের জন্যে সহজে অনুমতি দিচ্ছে না, আর সে কৃতিত্ব কমিশনেরই অবশ্য প্রাপ্য। যথার্থ বিশ্ব-জনমত সৃষ্টির জন্যে কমিশন সত্যি আশ্চর্য কাজ করেছে। আমরা যারা হাইপঙে ছিলাম, তারা নির্ঘাৎ জানতাম এগুলো একেবারে নির্জলা সত্য। মোহাজেররা বারে বারে একই কথা শুনাতো। তাছাড়া যারা বাস্তুত্যাগ করে ধরা পড়েছে এবং সাংঘাতিকভাবে সাজা প্রাপ্ত হয়েছে এমন অনেকের কথাও আমরা জানতাম।

কিন্তু কমিশনের পক্ষে করণীয় ছিলো তথ্য আহরণ করা আর তার রিপোর্ট পেশ করা। এর হাতে এমন কোনো শক্তি ছিল না যাতে ওরা 'ভিয়েৎমীন' মোহাজেরদের বাস্তত্যাগের অনুমতি দিতে বাধ্য করতে পারে। কমিশনের সদস্যরা যদি কোনো গ্রাম পরিদর্শনে যেতেন, পাবলিক স্কোয়ারে বড় টেবিল নিয়ে বসতেন। চারদিকে খবর দিতেন, যে কেউ এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিন্তু স্কোয়ারের ঠিক বাইরেই কম্যুনিষ্টরা রাস্তা ব্লক করে দিতো, যাতে গ্রাম কিংবা কাছাকাছি ক্যাণ্টন থেকে কেউ আসতে না পারে। ওরা বলতো, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রতিনিধির নিরাপত্তার জন্যে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থার কিছু নড়চড় হলেই প্রতিনিধিরা বিস্তর অভিযোগ আর তথ্যাদি পেয়ে যেতেন। তাও খুব ছোটখাট এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে।

যারা এসব অভিযোগ করতে আসতো, তারা সব সময় প্রতিশোধের ভয় করতো এবং তা চলতোও ঠিক। কমিশন প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের কাছাকাছি একটা ট্রাক ঠিক করে রাখতে পারতেন এবং জনসাধারণের অভিযোগ শুনে তাদের বাস্তত্যাগের অনুমতি দিতে পারতেন। ভিয়েৎমীন গ্রাম্য মোড়লদের সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু সেটাও খুব বেশী কিছু নয়। গ্রামবাসীদের কাছে একমাত্র রক্ষা-কবচ ছিলো ওঁদের সিদ্ধান্ত শুনবার পর যখন-তখন ট্রাকে চড়ে দ্রুত বাস্তত্যাগ। কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা অবলম্বন সহজ সাধ্য হতে পারেনি।

তাছাড়া কম্যুনিষ্টদের প্রতিনিধিত্বভুক্ত অন্য সব সংস্থাগুলোতে যে সব সমস্যা দেখা যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পোলিশ সদস্যরা বাধা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকতো। আমি নিজে কয়েকবার তাদের বাধা দেবার নজীর স্বচক্ষে দেখেছি।

একটা মোহাজেরকে নিয়ে গিয়েছিলাম কমিশনের কাছে। কম্যুনিষ্টরা তাকে বেদম মারপিট করে। কমিশন-কাউন্সিলের সভা হচ্ছিল। মোহাজেরটা তার কাহিনী বলল সব। কয়েকঘণ্টা বাকবিতণ্ডার পর তাকে পুনশ্চ ক্যাম্পে পাঠানো হল। প্রমাণ যোগাড় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। দুঃস্থ কৃষাণরা যে মার খেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মারটা কম্যুনিষ্ট ভিয়েৎমীনরা দিয়েছে তার কী প্রমাণ সে হাজির করতে পারে? তার বাহুর মাংস ভেদ করে যে বুলেট চলে গেছে তা যে

কম্যুনিষ্ট বুলেট তার প্রমাণ সে কোথেকে যোগাড় করবে? হতভাগা চাষীটি হয়তো প্রমাণস্বরূপ কিছু দেখাতে পারতো। কিন্তু তার আহতদেহ আর দুর্বল কণ্ঠ নিয়ে সে তা করতে পারল না।

সাধারণভাবেই কমিশনের নিযুক্ত ভ্রাম্যমান দলের চলাচল ছিল গোপনীয়। বিশেষ কোনো গ্রামে যাতে আগে থেকে ঠিক হয়ে না থাকে, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠিক হয়ে থাকতো অনেক কিছু।

অক্টোবর মাসে এ রকম একটা ভ্রাম্যমান দল টংকিনের একটা বড় শহর যাইবিন পরিদর্শন করেছিল। ওদিকে সব ঠিকঠাক করা। কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্যে কোনো লোকই পাওয়া গেল না। কাউন্সিলের শুনানীর জন্যে যারা এলো সবাই 'ভিয়েৎমীন' শাসনের উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করল। ভারি চমৎকার তাদের জীবন। চাষীরা সবাই সুখী। কেউ বাস্তত্যাগের অভিলাষ জানাল না। উত্তরাঞ্চলের 'আজাদ' জীবনযাত্রা সাম্রাজ্যবাদী দক্ষিণাঞ্চলের অধীনতা ও অত্যাচার থেকে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ···। অন্ততঃ এধরণের অনেক কথাবার্তায় সেদিন যাইবিনের আকাশ বাতাস মুখরিত হ'ল। সেখানে সেদিন অনেক ফটোগ্রাফার হাজির ছিলো। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু তখন সফর করছিলেন। তাই কম্যুনিষ্ট ও 'নিরপেক্ষ' সাংবাদপত্রের বিশ্বব্যাপী প্রচারণার একটা বড় রকমের খোরাক হলো।

সব দেখে শুনে, ফরাসী নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা ভাবলেন, এ ধরণের সাজানো ব্যাপার তারাওতো দেখাতে পারেন। মোহাজেরদের সাহায্যের ব্যাপারে ফরাসীরা যথেষ্ট সাহায্য করছিল এবং এর জন্যে ওরা সত্যি উচ্চ প্রশংসা পেতে পারে। যাহোক এব্যাপারে দিউক্সিম বুরো (ইনটেলিজেন্স)র ক্যাপ্টেন জিরানল্ড কাউবিন একটা প্ল্যান ঠিক করলেন। কাউবিন আর আমি উপযুক্ত লোক বাছাই করে নিলাম। বাকি কাজ করল নৌবাহিনীর ওরা। আমাদের সাজানো ব্যাপারটার স্থান নির্দিষ্ট করা হলো 'ফাট দিয়েম' হাইপঙ থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে 'বেম্বো কারটেইনের' অভ্যন্তরে অবস্থিত। মোহাজেরদের অনেকে আমাদের বলেছিল, ফাট-দিয়েমে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা দক্ষিণে চলে আসতে চায় কিন্তু পারে না। ওখান থেকে বাস্তত্যাগ করে এসেছে এরকম শক্ত-সমর্থ কিছু মেয়ে-পুরুষ বাছাই করে নিলাম। কাউবিন এবং আরো

করেকজন ফরাসী অফিসার ও আমার সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎকার হলো। ওদের বিশ্বাস অর্জন করতে আমাদের খুব বেশী সময় লাগল না। তাদের প্ল্যানটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। ওরা যার যার ভূমিকা গ্রহণ করলো। 'ব্যাম্বু কারটেইনে' পথে রওনা হল। বেরিয়ে আসা যেমন অনায়াস সাধ্য, প্রবেশ করা তেমন শক্ত ছিল না। ওরা গোপনে ফাটদিয়েমে প্রচার করে বেড়ালো, "যারা বাস্তত্যাগ করতে চাও, ফাটদিয়েমের গির্জায় সাধু সন্তের ভোজের দিন পয়লা নভেম্বর জমায়েৎ হও। সেখানে সি-আই-সি প্রতিনিধিরা তোমাদের পরিদর্শন করবে। তখন তোমরা তাদের কাছে তোমাদের অভিমত পেশ করতে পারো। নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারো।

ভিয়েৎমীন কম্যুনিষ্টরা ফাটদিয়েমের গির্জা বন্ধ করে দিতে পারেনি, সেই পবিত্র দিনে স্থানীয় লোকজনের গির্জায় জমায়েৎ হওয়ার কথা। ঐ এলাকায় ক্যাণ্টনগুলো থেকে হাজার হাজার লোক এলো। গির্জা থেকে মিশনের মাঠ অবধি লোক আর ধরে না। (ইন্দো-চীনে মিশনগুলোর সামনে প্রাঙ্গন থাকতো আর তার সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হতো গির্জা স্কুলের খেলার মাঠ)। নভেম্বরের পয়লা তারিখ ওখানে প্রার্থনার জন্যে অনেক মানুষ জড়ো হতো। একই সাথে হাইপঙ আর ভিয়েৎনামের অন্যান্য শহরগুলো থেকে একটা তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলা হল। সি-আই-সি সদস্যরা অবিলম্বে ফাটদিয়েমে গিয়ে সরেজমিনে ওখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের কাছে যে অভিযোগ এসেছে তা তদন্ত করে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানানো হল। সাইগণ থেকে এডমিরাল, জোয়ারভিলে, জেনারেল ও ডানিয়েল সমুদ্রে ফ্লাগশীপে অবস্থানরত এডমিরাল সাবিন, হাইপঙ থেকে মেয়র বট এবং আরো অনেক চিঠি আর টেলিগ্রাম পাঠালেন সেই বিশেষ ভ্রাম্যমান দলের অধিনায়কের কাছে। কিন্তু কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেল। ভ্রাম্যমান দল খুব শীঘ্রি ফাটদিয়েম যেতে পারলো না। এর কারণ আমি জানতে পারিনি —ওরাও আমাকে বলেনি। ওরা এক তারিখ, দু'তারিখ এমন কি তিন তারিখেও যেতে পারল না।

ফাটদিয়েমের জনসাধারণের কাছে গোপণে ধৈর্য ধরতে খবর পাঠানো হল। ওরা যেন গির্জায় অপেক্ষা করে। এডমিরাল কোয়ার ভিলে সি-

আই-সি সদস্যদের একটি হেলিকোপটার দিতে চাইলেন। ওদের অবশ্য দুখানা ছিল। তাদের ফাটদিয়েম যাবার জন্যে আরো অনেক আবেদন জানানো হল। তবু তাদের যাত্রার বিস্তর বিলম্ব ঘটল। ভিয়েৎমীন কম্যুনিষ্টরা এদিকে সন্দিহান হয়ে পড়ল। এদের একটি পবিত্র দিন তিন দিনে পরিণত হল, ব্যাপার কী! কম্যুনিষ্টরা ওদের বাড়ী ফিরে যেতে আদেশ দিল। কিন্তু কেউ সে আদেশ তামিল করলনা। ভিয়েৎমীনরা গির্জার ময়দানের বাইরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো। বাইরে সবাইকে তাদের কাছে পানি বা খাবার-দাবার বিক্রি বন্ধ করতে আদেশ দিল। পানি, খাবার কিছু ওরা খেতে পারবে না, খালি প্রার্থনা করুক আর মরুক— কম্যুনিষ্টরা আদেশ জারী করলো। এই ভাবে উপোষ রেখে মারার অস্ত্র সেই কারবেজের আমল কিংবা তারও আগে থেকে প্রচলিত ছিল। উনিশশ' চুয়ান্নর ভিয়েৎনামেও এই অমানুষিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন হল।

তবু, ওরা ওখানে অবস্থান করে রইল। দুর্বলচিত্ত দু'একজন শুধু বেরিয়ে এল। বাকি সবাই সি-আই-সি সদস্যদের আগমনের প্রতীক্ষায় রইল। কারণ তাদের প্রতি প্রেরিত সংবাদে ওরা সন্দিহান হয়নি। তাদের ধৈর্যের দৌড় খুব যে জোরালো ছিল, তা নয়। অনেকে অসুখ বিসুখের ভয় করছিল। তবু মুক্তি স্বপ্নে ওদের বিশ্বাস অটুট। তা-ই তাদের এই দুর্যোগের দিনে বাঁচিয়ে রেখেছিল। দিন গড়িয়ে চলল, চারদিন—পাঁচদিন-ছ'দিন তারপর সাতদিন। ক্ষুধার্ত শিশুরা কেঁদে কেঁদে সারা হল। মায়ের স্তনে আর দুধ নেই। শিশুদের আর মাতৃস্তন্য দেয়া গেল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সবাই জর জর হয়ে গেল। স্যানিটেশনের অভাবে অসুখের বীজ ছড়িয়ে পড়ল। তবুও ওরা অপেক্ষা করে রইল—আর কেবল প্রার্থনা করে চলল কায়মনোবাক্যে।

অবশেষে, দশই নভেম্বর সি-আই-সি প্রতিনিধিরা গিয়ে ফাটদিয়েমে হাজির হলেন, এক'শ গজ দূরে থাকতেই ওরা এতো তীব্র গন্ধ পাচ্ছিলেন যে গা বমি বমি করছিল। কানাডীয় সদস্যরা বলছিলেন, পোলিশ কম্যুনিষ্টরা পর্যন্ত জনগণের এই দুর্দশা দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সি আই-সি প্রতিনিধিরা সহস্রাধিক ঘোষণা পত্র গ্রহণ করলেন। লোকগুলোর পানাহারের ব্যবস্থা করবার জন্যে জরুরী আদেশ জারী হল। মিশনের বাইরে তাদের চলাফেরা করবার অনুমতি দেওয়া হল। ভিয়েৎমীনের কম্যুনিষ্ট-শাসকদের

বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান হলো। হ্যানয়ে এসে হো-চি-মীনের সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিবৃতিও প্রকাশ করা হল।

বিশ্বজনমতের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্যে ভিয়েৎমীন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ফাটদিয়েমের জনসাধারণকে নির্বিবাদে বাস্তুত্যাগ করতে অনুমতি দিতে আদেশ জারী করলো। কিন্তু তবু এতেও ওরা নানা ফাঁদ পাততে দ্বিধা করেনি।

'ভিয়েৎমীনেরা' দিনে এক'শো লোক চালান দেখা যায়, এরকম কয়েকটা অফিস করল। দরখাস্তকারীরা অনেকগুলো কাগজ পূরণ করে দিলে তবে একটা অফিস থেকে পাসপোর্ট পেতো। আরেক অফিস থেকে ভিয়েৎমীন বাসের জন্যে টিকিট দেওয়া হতো। ঐ বাস ওদের হাইপঙে নিয়ে যেতো। টিকিটের দাম আট হাজার হো চি মীন পিয়েষ্টার—ন'টি মার্কিন ডলারের সমান। ছ'জন লোকের ছা-পোষা চাষীদের পক্ষে এটা জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। বাস্তুত্যাগ সম্পর্কে বাইরের লোক শুধুলে 'ভিয়েৎমীনরা' জবাব দিতো, "হাঁ, আমরা ব্যারো করেছি, পাসপোর্ট দিচ্ছি, যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করেছি। যারা অন্যত্র চলে যেতে চায়, তাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমাদের 'ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব ভিয়েটনামে' কোনো অন্যায় অবিচার নেই।

পনেরোই নভেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত ফাটদিয়েম থেকে কোনো মোহাজের দল বাস্তুত্যাগ করতে পারেনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ। এর জন্যে ভিয়েৎমীনদের কম ঝক্কি পোয়াতে হত না। বাসে করে যাত্রা শুরু। পথে বাস থামিয়ে রাখা হল। বলা হল, বাস ঠিক করতে হবে। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। এর মধ্যে ভিয়েৎমীনরা জোর বক্তৃতা করে বোঝাতে প্রয়াস পেল। ওরা স্বেচ্ছায় কী বিপদ ডেকে আনছে নিজেদের উপর। শোনাল, হাইপঙ আর সাইগনে মার্কিন আর ফরাসীদের ক্যাম্পে কাল্পনিক পাপাচারের কাহিনী!

তারপর মোহাজেরদের বড় চীনা-পোত আর সাম্পানে রেড রিভার পাড়ি দিয়ে নিয়ে আসা হল হ্যনয়ে। আবার দেরী, জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা, আবার হতাশা। হ্যনয় থেকে অবশেষে ট্রেনে চেপে হাইপঙ। সেখান থেকে ফরাসী ট্রাকে চড়ে কিছু সময়ের মধ্যে ওরা আমাদের ক্যাম্পে এসে গেল।

হাজার হাজার অন্যান্য মোহাজেরকে এভাবে কম্যুনিষ্টরা যতো রকমে পেরেছে বিলম্ব করিয়েছে। তাতে 'ব্যাম্বু কারটেইনের' প্রান্ত সীমায় আসার বহু পূর্বেই তাদের পনেরো দিনের মেয়াদী পারমিটের সময় পেরিয়ে গেল। তাই আবার তাদের পুরনো গ্রামে ফিরে যেতে হল। গোড়া থেকে আবার বাস্তুত্যাগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হল। ভাগ্যবান মোহাজেররা মাঝখানে একটা লিফ্‌ট পেয়ে গেল। ব্যাম্বু কারটেইনের প্রান্তসীমা বাকক্যু-তে ফরাসী নৌবাহিনীর ছোট্ট পোতগুলো অপেক্ষা করছিলো। সেখানে কম্যুনিষ্ট পোতগুলো থামিয়ে সি-আই-সি সদস্যদের মোকাবিলায় ওরা মোহাজেরদের দ্রুত হাইপঙ নিয়ে আসার জন্যে তাদের হাতে ভার দিতে দাবী জানাল।

হাজারো বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, জ্বালাময়ী বক্তৃতা থেকে গা বাঁচিয়ে যানবাহনের অসুবিধা কিংবা ভিয়েৎমীন অত্যাচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ফাটদিয়েমের জনসাধারণ বাস্তুত্যাগ করল। সি-আই-সি সদস্যরা এলাকা পরিত্যাগ করার পূর্বে যে হিসেব নেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় মোট পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচ হাজার লোক তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হল।

যুদ্ধে যুদ্ধসংগীতের সৃষ্টি হয়। রোলাণ্ড আর্থারের মতো সুর-স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধে নানা শৌর্যবীর্যের গাথা-কাহিনীর সৃষ্টি হয়। বাটান আর ইঙ্কনের মতো বীর ধরার ধূলোয় নেমে আসেন। টংকিনে যে আশ্চর্য শান্তি নেমে এসেছে তাতেও দেখা গেল অনেক শৌর্য-বীর্যের নিদর্শন। যে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ্য নিদর্শনের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এরকম অনেক কাহিনী আমার জানা আছে। কয়েকজন তো আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল। আর শতাধিক কাহিনীর কথা লোক মুখে শুনেছি।

মনে পড়ে নভেম্বরে আগতো বুইচু প্রদেশের মোহাজের ভাইদের কথা।

বুইচু হল হাইপঙের আশি মাইল দূরবর্তী একটি প্রদেশ। অন্যান্য এলাকার মতো বুইচুতেও কম্যুনিজমের আলোই হল ওখানকার একমাত্র অন্ধকার। জনসাধারণের কুঁড়েঘর থেকেও পারিবারিক শান্তি বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনী-শক্তি মরে যায়নি, লুপ্ত হয়নি তাদের উচ্চাশা।

বুইচুর অধিবাসীরা ছিল বেশ ধনী। সবুজ এলাকা জুড়ে ওদের শস্যক্ষেত্র। কোথাও বা মহিষ ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারপর শুরু হল আট বছরব্যাপী যুদ্ধ—প্রথমে ঔপনিবেশিক, পরে মতবাদ ঘটিত। যুদ্ধের শুরুতে ঘটল বিনাশ। ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হল। পরিবার পরিজন ভেঙ্গে গেল। শস্য কেড়ে নেওয়া হল। মেষগুলো মারা গেল। জমিগুলো হয়ে পড়ল অনাবাদী। চাষীদের দুর্যোগ-দুর্ভোগের অবধি রইল না। জমি, পূর্বপুরুষ আর পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের সমস্ত জীবন। এখন শুধু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রইল না। নতুন কর্তারা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল নতুন আইন কানুন। ধনতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৈনিক বক্তৃতা শুনতে এই চাষাভুষোদের বাধ্য করলো। ঔপনিবেশিক ভিয়েৎনামের নানা প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্যময় রাজনীতির বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগল। 'প্রতিক্রিয়াশীল' আর "সামন্ততান্ত্রিক" ছাড়া প্রতিটি

জিনিস ধ্বংস করতে ওরা বদ্ধপরিকর। পরিবারের প্রতি আনুগত্য তাদের কাছে সামন্ততান্ত্রিক, আর গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিক্রিয়াশীলতার নিদর্শন। গোটা প্রদেশ জনসাধারণের কাছে একটা কারাগার বিশেষে পরিণত হল। প্রশ্নোত্তরে খৃষ্ট ধর্মের উপর লেখা যে সব বইপত্র ছিল, সব পুড়িয়ে ফেলা হল। তাদের বলা হল, ধর্ম হচ্ছে ঘুমের দাওয়াই। শান্তিহীন, স্বস্তিহীন, পূজার্চনাহীন এমনকি পর্যাপ্ত খাওয়া-পরাহীন এক নৈরাজ্যের জীবনধারা প্রবাহিত হল।

কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কে ওদের কাছে প্রতিশ্রুত পরিবর্তন এখানেও সাধিত হল। এর মানে, যাদের কাছে দুই 'মনু'র (একটা খেলার মাঠের সমান) উপর জমি আছে ওদের 'ধনতান্ত্রিক' বলে বিবেচনা করা হল। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করছে বলে তাদের অভিযুক্ত করা হল। পরে আমি যখন কয়েকজন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এ ভাবে জমি পেয়ে ওরা খুশী হয়েছে কিনা, ওরা জবাব দিয়েছিল, "এতে আমাদের পেট ভরেছে, কিন্তু মন ভরেনি। কারণ আমরা জানি, এটা অন্যায়।" তাছাড়া, আগেই আমি বলেছি, কিছু জমি ওরা পেয়ে গেলেও এতে ওদের সুবিধা হয়নি। কারণ অতিরিক্ত করভারে ওদের জীবন পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। যাদের বেশী পরিমাণ জমিজমা ছিল, ওদের অবস্থা ভারি খারাপ হয়ে পড়ল। যার বেশী জমি আছে, সে স্বভাবতঃই বেশ ধনী আর প্রতিপত্তিশালী লোক। আর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কোনো ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না—অবশ্য শুধুমাত্র পার্টি-সদস্য ছাড়া। এদের কখনো কখনো বলা হতো, পার্টি সদস্য হবার জন্যে যদি ওরা সম্মতি না দিতো, যদি ওরা তাদের জমিজমা আর ধর্ম বিসর্জন দিতে রাজী না হতো আর তাদের ছেলেদের বেসরকারী সেনাবাহিনীতে না পাঠাতো, তা'হলে তাদের শিরশ্ছেদ করা হতো। কী, আমি বাড়িয়ে বলছি? কখনো নয়, এই সব লোকের ছেলেরা আমায় বলেছিল, স্বচক্ষে ওরা তাদের বাবা-মার শিরশ্ছেদ দেখেছে। ওরা মিথ্যে বলেছে এটা আমি বিশ্বাস করি না।

বুই-চু'র জনসাধারণের সামনে একটা পথ খোলা রইল—বাস্তুত্যাগ। এতেই কেবল নিহিত রয়েছে বাঁচবার স্বপ্ন। কিন্তু এটা ভাবতে যতো সহজ, বাস্তবে পরিণত করা ততো কঠিন।

কেবলমাত্র বুই-চু প্রদেশে ত্রিশ হাজারের উপর ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী বাস করতো। ভিয়েৎনামে ফরাসী আর যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীতে মিলে খুব সন্তর্পণে একটা পরিকল্পনা ঠিক করা হল। তারিখ, সময় আর স্থান নির্ধারিত হল। তারিখ হল নভেম্বরের তিরিশ; জায়গাটা প্রদেশের প্রান্তসীমায় সমুদ্র তীরবর্তী জেলেপাড়া—'ভ্যানলী'-তে।

ফরাসীর বড় 'রিপেয়ার' জাহাজখানা 'জুলসভার্নে' তীরের তিন মাইল দূরে এসে ভিড়লো। চারখানা এল. এস. এম. গিয়ে 'জুলসভার্নে'র পাশে কল্পিত রিপেয়ারের লোকজন খালাসের জন্যে ভিড়ল। পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর বড় জাহাজ 'দি জেনারেল ব্রিউস্টার' সাইগন থেকে এই পথে হাইপঙ ফিরে যাচ্ছিল, এখানে এসে সেও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভিয়েৎনামে জনগণের কাছে গোপনে একথা প্রচার করা হল। পালানোর সময় কাছিয়ে এল। সমুদ্রে বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের উঠানামা। সমুদ্র তীর থেকে জাহাজ অবধি তিন মাইল তরঙ্গসংকুল পথে চন্দ্রালোক ছাড়া আর কিছুই নেই। অবশ্য তা খুব উতল। তাই খানিকটা ভয়েরও কারণ। তারপর পালানোর সঠিক সময়টা এগিয়ে আসে। রাত আটটায়। কিছু-ক্ষণের মধ্যে সমুদ্রে অনেকগুলো ছোট্ট নৌকো, দাঁড় টানার শব্দ ভেসে এলো। হাজার হাজার বাস্তুত্যাগী এসে ভিড় করল বালিয়াড়িতে। ছোট্ট নৌকোগুলো ওরা বালির মধ্য দিয়ে জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়ে দিল। এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ওদের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ক্ষুদে ফরাসী পোত।

দু-পক্ষ একত্র হতেই ফরাসী পোতের দরজা খুলে গেল আর অমনি তার মধ্যে মোহাজেররা নিশ্চুপ ঢুকে পড়ল। ফরাসী পোত ছুটে চলল 'ভ্রার্নি' এবং 'ব্রিউস্টার'-এর দিকে। তাড়াহুড়ো করে এই অসহায় মানুষ গুলোকে নামিয়ে আরো কিছু নিয়ে আসতে ছুটে চলল।

ছোট্ট একটি বাঁশের ভেলা—দৈর্ঘ্যপ্রস্থে কয়েক ফুট মাত্র, এর উপর সওয়ার হয়েছে দশজনের একটি পরিবার। বাদামী কাপড় পরা লোকগুলো ভয়ে চুপ। ভেলা কখনো সমুদ্রের পানিতে এক হাঁটু ডুবে যাচ্ছে। আর ওরা ওদের ছেলেমেয়েদের উঁচিয়ে ধরে আছে, চন্দ্রালোকে চিকমিক করছে চারদিক। এতে যদি ওরা ধরা পড়ে? অশান্ত সমুদ্র। তাদের

যদি ডুবিয়ে দেয় মাঝপথে? দু'টো মাত্র জাহাজ। এতগুলো লোকের কী ঠাঁই হবে? শত্রুরা কী এখনো টের পায়নি? ঠিক এখুনি যদি মেশিনগানের গুলী এসে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, তা'হলে? বাঁশের ভেলা নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভিয়েৎমীনদের মনে সভয় প্রশ্ন জাগছিল। কিন্তু বুকের পাটা আছে ওদের। তাই পরোয়া করেনি কিছুই। মৃত্যু-ভয়ও আজ ওদের কাছে তুচ্ছ। সকালের দিকে দেখা গেল, দু'টো জাহাজে ছ'হাজারের মতো মোহাজের। এদের নিয়ে পাড়ি দেয়া হল হাইপঙের পথে। আমাদের ক্যাম্পে ওদের নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে গেল বুই চু-তে বাকী মোহাজেরদের নিয়ে আসবার জন্যে।

দু'দিন দু'রাত এভাবে বাস্তুত্যাগীদের নিয়ে আসার কাজ চলল। সব শুদ্ধু মোহাজের সংখ্যা দাঁড়াল আঠারো হাজার। তৃতীয় দিনে সমুদ্র তীরে বাস্তুত্যাগীদের ভিড় দেখা গেল না। একটি ক্ষুদ্র দল দাঁড়িয়ে আছে বালিয়াড়িতে আর তাদের পাশে একপাল সৈন্য। ভ্যানলীর বাস্তুত্যাগ এভাবে বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু বন্দীদের মুক্তি-স্বপ্নকে ওরা স্তব্ধ করে দিতে পারল না। আবার সময় এল, ···আবার এল সুযোগ। ওদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা শুরু হল।

দিন নেই, রাত নেই, দু'টো জাহাজে ভর্তি হয়ে এই বিশেষ মোহাজেররা আসতে লাগল হাইপঙে। জেটিতে ওদের নামিয়ে দেয়া হল। সেখান থেকে আমরা গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে এলাম ক্যাম্পের প্রবেশপথ পর্যন্ত। মূল ক্যাম্পগুলোর দূরত্ব তখনো আধ মাইলের মতো। পয়লা রাতে মোহাজেরদের নিয়ে ট্রাকগুলো প্রবেশপথে নামিয়ে দিলে। আগের দিন যে কয়েক হাজার মোহাজের এসেছিলো, ওরা ওদের অভ্যর্থনা জানাল-অনেকের হাতে লণ্ঠন কিংবা মোমবাতি। এই ক্ষীণ আলোর মাঝখান দিয়ে বিষাদের প্রতিমূর্তির মতো এই মোহাজের দল এগিয়ে চলল তাদের গন্তব্য পথে। পরস্পরকে ওরা শুধালো নানা রকম প্রশ্ন, সব আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-পুলেদের সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু প্রশ্ন আর জবাবে কেমন যেন হতাশার সুর মেশানো।

"ডুকলী পরিবারের কাউকে দেখেছো?"

"ঐযে ভেলাখানা ডুবো ডুবো হয়েছিল, সেখান থেকে সাঁতরে কেউ উঠতে পেরেছিল কি?"

"আচ্ছা, যান হোয়া গ্রামের খবর শুনেছো কিছু?"

"আমার সাত বছরের খোকাটিকে কেউ দেখেছো?"

আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ কেউ পেল, অনেকে আবার পেল না।

ওরা ক্যাম্পে আসার পর বেশ কিছুদিন ধরে ওদের চিকিৎসাধীন রাখতে হলো। ছেলেমেয়েদের অনেকের মুখে বসন্তের গোপন দাগ বিদ্যমান। অনেকের আবার নতুন ধরণের মহামারী দেখা দিল; নানারকম বিষাক্ত জিনিসের সংস্পর্শে হয়তো। কয়েকজনের জ্বরের তাপ ভীষণ। ডিহাইড্রেশানের ফলে ওদের শরীর ব্যথাতুর হয়ে পড়েছিল। এই একটি রোগের চিকিৎসায় আমাকে তিন-চারদিন কাটাতে হলো। বেরিবেরি আর স্কাডিও যথেষ্ট। আসলে, কম্যুনিষ্টদের তথাকথিত কৃষি উন্নয়নের ফলে ওখানে এসব ভিটামিন অভাবজাত রোগের জন্ম। ওরা অনেককে উপোস রাখবার ব্যবস্থা করেছিল। একেবারে মেরে না ফেল্লেও জ্যান্ত মারবার ব্যবস্থা করেছিল অনেকের। বেরিবেরিতে ওদের পায়ের গোড়ালি অবধি এতো দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, বেশী হাঁটাহাঁটি করতেও ওরা অক্ষম হয়ে পড়েছিল। কারু গোড়ালি ফুলে এমন হয়ে গিয়েছিল যে, একটু টান পড়লেই যেন ছিঁড়ে যাবে। অনেকেই স্যাণ্ডাল পরতে পারতো না। নরোম ঘাসের উপরও হাঁটতে পারতো না। স্কাডিতে-ওদের হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়েছিল। রুগী দেখার তাঁবুতে বসে দেখতাম, অনেকের হাড় গেছে ভেঙ্গে, দাঁতের মাড়ি গেছে পচে, নষ্ট হয়ে দাঁত যাচ্ছে পড়ে।

আমার সহকারীরা রাত্রিতে তাঁবুতে গিয়ে যারা খুব বেশী ব্যথা-বেদনায় ভুগছে তাদের মরফিন ইঞ্জেকশান দিয়ে আসতো। কিন্তু এভাবে যখন হাজার হাজার কেস আমাদের ঘাড়ে এসে চাপল অকস্মাৎ, তখন, ইনজেকশান দেয়া কমিয়ে দিতে হল। মরফিন কিংবা ও ধরণের অন্য কিছু ওষুধ হাইপণ্ডে পাওয়া যেতো না। অনেক কাজে পেনিসিলিনই নির্বিবাদে ব্যবহৃত হতো। আমেরিকা থেকে আমার কাছে যথেষ্ট পেনিসিলিন এসেছিলো। আমরা প্রতিদিন প্রায় দু'শোর উপর রুগী দেখতাম। এই দু'শোর উপর রুগীর হাত, পা, মুখ কিছু-না-কিছু ভেঙ্গে গেছে, নয় তো বিকৃত হয়ে গেছে।

অনশন তাদের শরীরে অনেক চিহ্ন রেখে গেছে। শিশুদের ঢিলে পেটে রয়েছে তার নিদর্শন। অনেকে আবার সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত। এতে ওরা আরো কাহিল। এই হতভাগ্য মানুষগুলো সবাই আমার রুগী।

আমার মনে হয়, বুইচুর অধিবাসীদের সাথে আমাদের মার্কিনবাসীদের খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। মার্কিনীরা কেউ এই ভিয়েৎনামবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হলে তাদের পছন্দ না করে পারবেন না। স্বাধীনতার জন্যে তারা যে ত্যাগস্বীকার করেছে তাতে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারবেন না। এই বুইচুর জনগণের মতো অমন সাহসী মানুষের বীরগাথার প্রশংসা না করে পারবেন না। তাদের আর আমাদের মধ্যে আসল পার্থক্য হচ্ছে, আমাদের স্বাধীনতা আছে; আমরা তা বজায় রাখতে অন্তরের তাগিদ অনুভব করি। ভিয়েৎমীনদের তা নেই; তাই ওরা অন্তরের তাগিদ অনুভব করে সমস্ত বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তা ছিনিয়ে আনতে।

বাস্তুত্যাগী দল মৌসুমী বৃষ্টির মতো এসে ভিড় করছিল আমাদের ক্যাম্পে। কাছাকাছি রাস্তায়, মাঠে ওদের অগুণতি সমাবেশ। যতো তাড়াতাড়ি পারি, তাদের সুস্থ করে তুলে বিদায় দিচ্ছি। প্রতিদিন প্রায় চার-পাঁচ হাজার বিদায় করছি। কিন্তু নবাগত আসছে তার চাইতে অনেক বেশী।

আমার তাঁবুর অধিবাসীদের এই হচ্ছে রীতি। একহাঁটু কাদামাটিতে বিস্তৃত আমার তাঁবুর শহর। পোকা-মাকড়, ময়লা-আবর্জনা, মহামারী-মড়কে আমরা বিধ্বস্ত। তবু আমাদের তাঁবু ছিল আমার গর্বের বাতিঘর; বীরত্বের উপাখ্যানে ভরপুর।

যদিও ক্যাম্পে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা একেবারে নিরানন্দ হয়ে পড়েছিল, তবুও ভিয়েৎনামে এসে একই ধরণের কাজ কেমন জানি একঘেঁয়ে হয়ে পড়েছিল। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস, আমরা সেই একই রোগ, একই দুর্দশার সম্মুখীন হচ্ছিলাম, জিনিস-পত্রের স্বল্পতা আর সাহায্যের অসুবিধা একই রকম ভোগ করছিলাম। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, নানাবিধ দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে আমাদের উপর যারা নির্ভরশীল ছিল, তাদের অসুবিধা দূরীভূত করতে আমরা সমর্থ হচ্ছিলাম না। এর সাথে আবার যোগ করা যায় আমাদের ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলো। গরম পানির অভাব, পরিষ্কার কাপড়ের অভাব, অস্বাভাবিক গরম, ক্রমাগত ঘর্ম-সিক্ত হওয়া, বিদেশী ভাষায় সর্বক্ষণ কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আর প্রতিদিনের কাজের বিরক্তি—সব মিলে আমাদের হাঁপিয়ে তুলছিল। এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেয়া যায়; টেবিলের উপর পা-টা ছড়িয়ে একটু জিন আর টনিক খেয়ে কমিক পত্রিকা পড়ে সময় কাটানো যায়। কোনো বিকেলে যদি এমনি সময় কাটাই, অমনি একটা অপরাধ-বোধ মনে জেগে ওঠে, আর তক্ষুণি বিকেলের আনন্দ উবে যায়।

নদীতে কখনো নৌ-বাহিনীর জাহাজ এলে আমরা ওখানে যেতাম। গরম পানিতে দাড়ি চেঁছে, ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা আপন লোকের মাঝে কাটিয়ে ফিরতাম। জাহাজের লোকগুলো যখন আমাদেরকে তাদের কোয়ার্টারগুলো সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দিতো—ওরা বুঝতে পারতো না আমার সহকারী কিংবা আমার কাছে এর মূল্য কতটুকু। বাস্তুত্যাগ-পর্বের শেষের দিকে যুক্ত-রাষ্ট্রের জাহাজগুলোতে আমাদের এ ধরণের সফর রীতিমতো একটা আকর্ষণ ছিল। আমরা যারা তীরে ছিলাম, তাদের কাছে 'দি কুক', 'দি ডায়াচেংকো', 'দি বাস', 'দি রেগোর', 'দি বলডাক' প্রভৃতি এ-পি-ডিগুলো 'দি কুইন মেরী' জাহাজের মতো উন্নত মনে হতো। ওদের নাবিক এবং অফিসারদের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারে মনে কিছু স্বস্তি ফিরে পেতাম।

যাহোক, হাইপঙ প্রবাসে আমাদের জন্যে অবশ্য আরেকটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। তা হল, মাদাম ভ্রথি গাই প্রতিষ্ঠিত আনলাকের এতিমখানা। প্রায় শতাধিক হাসিখুশী ছেলেমেয়ে এই এতিমখানার বাসিন্দা। আমরা যেমন ওদের, ওরাও ঠিক তেমনি আমাদের আপন করে নিয়েছিল। মাদাম গাই ছিলেন এর অধ্যক্ষা। আমার সহকারী এবং আমি—দু'জনেই এর মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। যুক্তরাষ্ট্র নৌ বাহিনী এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক। প্রথমে সামান্য মেলা-মেশা থেকে আমার দিন গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে ওদের খুব বেশী মাতামাতি শুরু করে দিয়েছিলাম। যখনই সুযোগ পাওয়া যেত, শিশুদের জাহাজে নিয়ে যাওয়া হতো আর মার্কিনী ধরণের পার্টিতে আপ্যায়িত করা হতো।

মাদাম গাই ছিলেন টংকিনের একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। এক সময় বেশ বিত্তশালী ছিলেন তিনি। ভারি সুন্দর মহিলা, চমৎকার গায়ের রঙ, কালো চুল, মুক্তার মত দাঁত। বেশ বড় আয়ত চোখ। তাঁর মনোলোভা প্রাচ্যদৃষ্টি যে-কোনো লোকের মনে দাগ কাটতে সমর্থ। বেশ ডাগর-ডোগর ভদ্রমহিলা। এতিমখানা পরিচালিকা অন্যান্য মহিলাদের ন্যায় তিনিও ছিলেন শক্তসমর্থ অথচ দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারিনী। প্রকৃতি ছেলেমেয়েদের ভালো-বাসবার, অপত্যস্নেহে ভালোবাসবার অফুরন্ত শক্তি তাঁর অন্তরে সঞ্চিত করে রেখেছিল। মাদাম গাই যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের টাকার থলের বাঁধও উন্মুক্ত করিয়ে ছেড়েছেন। আর খুব কম লোকের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি। বিশেষ করে, সহৃদয় মার্কিনদের সুদৃষ্টি তিনি বরাবর লাভ করে এসেছেন।

সারা ভিয়েৎনামে মাদাম গাইর মতো আরেকটি শুধু চমৎকার মেয়ে ছিল। সে তাঁর আশ্রিতা ছোট্ট লিয়া। লিয়া সম্পর্কে কিছু বলি এখন।

সাত বছরের মেয়ে এই লিয়া। চমৎকার তুলতুলে পরিপূর্ণ আকারের প্রাচ্য পুতুলের মতো দেখতে সে। চমৎকার ছোট্ট আকৃতি, আশ্চর্য স্বচ্ছ তার গায়ের রঙ। একটু লাজুক। যখন কারু সাথে মেশে, প্রাণখুলে মেশে। লিয়া ছিলো এতিমখানার বড় মেয়েদের একজন। তাই তার সাধ্যমত শিশুদের জন্যে কাজ নিয়ে সে ব্যস্ত থাকতো; লিয়ার ছিল শুধু একটি খুঁত। তার একটি মাত্র পা। অন্য পায়ের জায়গায় ছোট্ট কাঠের পা। উনিশ শ'

চুয়ান্নর জানুয়ারীতে ফুলী শহরের কাছে এক খনিতে পড়ে তার পা ভেঙ্গে যায়। এবং উরু থেকে তার ডান পা কেটে ফেলে দিতে হয়। চিরজীবনের তরে খোঁড়া হয়ে পড়ে সে। ডান পায়ের বদলে তাকে কাঠের ক্রাচ ব্যবহার করতে হয়। আগস্টমাসে আমি যখন প্রথম এই এতিমখানায় আসি, তখন তাকে দেখি। কিছুদিন পর সে আমাকে তার পায়ের গোড়ালি পরীক্ষা করতে দেয়। ইতিপূর্বে তার ভালো চিকিৎসা হয়নি। ট্রান্সমেটিক এ্যামপুটেশনের ছ'মাস পরেও মাংসপিণ্ড কাঁচা দানাযুক্ত রয়ে গেছে। আমি লিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাকে তার খোঁড়া পায়ের যত্ন নিতে দেবে কিনা। লিয়া জবাব দিল, নিশ্চয়ই দেবে। কারণ, 'ব্যক সীমাইকে' সে ভালোবাসে। নতুনভাবে আমাকে চিকিৎসা শুরু করতে হল। সামান্য সার্জিক্যাল চিকিৎসার পর ক্ষতের একটু সুরাহা করা গেল। তারপর লিয়াকে যা আদেশ দিতাম, তাই করতো সে। সে ওখানে ড্রেসিং করতো, পরিষ্কার করতো, শুকিয়ে রাখতো। ফলে ক্রীসমাসের মধ্যেই তার পায়ের গোড়া পুরোপুরি ভাল হয়ে যায়। আমি লিয়ার ইতিহাস জানিয়ে সেণ্ট-লুইস এ, এস, এলোই কোং-র হেনরী শার্কের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র দিলাম। ওদের কাছ থেকে সত্বর সাড়া পাওয়া গেল। ওরা যদিও ওদের কাছে যে কৃত্রিম পা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, তা পাঠাতে পারল না, তবু সেণ্ট লুইস হ্যাঞ্জার লিম্ব কোং-র সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল। দু'টো প্রতিষ্ঠান মিলে ঠিক করল, যে লোক এই নতুন পা তৈরী করতে পারে, সে তখন নিউ জার্সির কসমেভো এমবুলেটর কোং-তে কাজ করে। তাই ওরা আমার কাছে মাপ্‌জোক চেয়ে পাঠালো। আমি তা পাঠিয়ে দিলাম। এই ছোট মেয়েটির বয়োবৃদ্ধির সাথে খাপখাওয়ানো যায়, এমনি করে ওরা একটি পা তৈরী করল। দিন কয়েকের মধ্যে তা হাইপঙে এসেও পৌঁছলো। লিয়ার এখন একটি নতুন পা হল। একটি আমেরিকান পা! প্রথম যখন পা'টি লাগিয়ে সে হাঁটতে লাগল, খুশীতে তার চোখ-মুখ জলজল করে উঠল। আনন্দের আবেগে সে কেঁদে ফেলল। হাসল, আবার কাঁদল। মনোবেদনায় বেকার আর মাদাম গাইও তাই করে বসল। অস্বীকার করে লাভ নেই, আমিও বাদ যাইনি। কৃতজ্ঞতায় ধন্যবাদ না জানানো অবধি লিয়ার দু'চোখে জল ভরে এল। হায়, আগে কে জানতো লিয়ার নতুন পা-টা এতিমখানায় নৈতিক সমস্যার উদ্ভব করবে!

ভিয়েৎনামের ছোট্ট মেয়েরা সাধারণতঃ পায়ের গোঁড়ালি অবধি কালো লম্বা প্যাণ্ট পরতো। কিন্তু নতুন পা দেখাবার আতিশয্যে লিয়া প্রায়ই প্যাণ্ট পরা বাদ দিতো। ছেলেমেয়েরা যদিও নেহাত বাচ্চা, তবু এটা খুব ভালো দেখায় না। তাই লিয়াকে আমরা প্যাণ্ট পরবার জন্যে জোর করতাম। সে পা'টিকে এতোই পছন্দ করতো যে, ওটি নিয়ে ঘুমুতো পর্যন্ত; মানা করলেও শুনতো না। বলতো, তার ভিয়েৎনামী পা নিয়ে ঘুমুতে আপত্তি না থাকলে মার্কিন পা নিয়ে ঘুমুতে আপত্তি কিসের!

কসমেভো কোং-র মিঃ কসমো ইনভিডিয়েটো সম্প্রতি আমায় লিখেছেন, তাঁর কোম্পানী লিয়ার ভার 'গ্রহণ' করেছে। তিনি লিখেছেন, "আপনার চিঠি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিসূত্রে জানা গেল, আমাদের দূরপ্রাচ্য প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। নিজের দেশে বসে এদের ক্রমাগত স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।" তাঁকে আজ এ-কথাই শুধু বলতে পারি, তাঁর প্রতিষ্ঠান লিয়ার জীবনে যথেষ্ট কাজে এসেছে।

গাইয়েন বলে আরেকটা ছেলেকে আমরা খুবই ভালোবাসতাম, তার নামের শেষটা আমরা জানতে পারিনি। মাদাম গাই বলেছিলেন, তিনি ছেলেটিকে পেয়েছিলেন খাইবিন গ্রামে, তখন ওর বয়েস চার বছর। গাইয়েনের বয়েস এখন ছয়। তার মুখের হাসি সবার হৃদয় জয় করে নেয়। মুখের আদল ভারি মিষ্টি। তার মেরুদণ্ডে টিউবারকিউলিসিস হয়েছিলো, তাতে সে কুঁজো হয়ে পড়ে। সোজা হয়ে হাঁটা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। তাই হংসগতিতে তার চলাফেরা। ভালো করে বসতেও পারে না। খাবার-দাবার শুয়ে শুয়ে খেতে হয়। হাসে সে খুব কম। কিন্তু হাসলে তাকে চমৎকার দেখায়। একবার হাসতে শুরু করলে হেসে গড়াগড়ি দিত। কেউ তাকে অন্য কারু সঙ্গে রাখতে পারত না। মার্কিন জাহাজে বেড়াতে গেলে সেই হতো ওখানকার আকর্ষণ। তার কাছে অন্ততঃ পনেরোটি নাবিকের টুপি ছিল। ওগুলো ওরাই তাকে দিত, নয়তো সে জোর করে নিয়ে নিত।

আরেকটি বছর দু'য়েকের বাচ্চা ছিলো। নামটি তার ভুলে গেছি। তখন তার দু'চোখে ট্রেকোমা ধরে গিয়েছিল। ওই দু'বছরে সে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে হয়তো। শৈশব থেকে ত'র ভালো যত্ন-আত্তি নিলে আজ

তার দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার থাকতো। কিন্তু তার ভাগ্যে তা জোটেনি। তাই চিরতরে সে অন্ধকার দুনিয়ার বাসিন্দা।

এতিমখানায় আরো অনেক ছেলেমেয়ে ছিল যাদের আঙ্গিক পরিবৃদ্ধি হয়নি, কেউ-বা জন্মগত গণোরিয়া আক্রান্ত বলে, কেউ-বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে, কেউ-বা স্প্যাসটিয় বা অন্যান্য রোগাক্রান্ত বলে। অত্যন্ত ঝুনো ডাক্তারের কাছে এদের দেখে করুণার উদ্রেক করবে। মৃত্যুর বাস্তব পরিচয় ওরা পেয়েছে। মৃত্যু-ভীতি ও যন্ত্রণা ওরা উপলব্ধি করেছে। গ্রাম লুণ্ঠিত হতে, শস্যক্ষেত্র নষ্ট হতে আর মৃত্যুপথযাত্রীর কাতর অভিব্যক্তি ওরা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু খোদা কচিকাঁচাদের মনে বিস্মৃতির যবনিকা তুলে দেন, তাই খুব শীগগিরই ওদের মানসপট থেকে পেছনের পাশবিক স্মৃতি অবলুপ্ত হল। আবার ওরা হাসল, ভালোবাসল, জীবনকে ওরা সুন্দর আর সম্পূর্ণ করে নেবার আয়োজনে মেতে উঠল।

আমরা যারা মাদাম গাইকে সাহায্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাদের ধন্যবাদ জানানোর জন্যে একদিন তিনি ডিনারের দাওয়াত দিলেন। আমাদের জন্যে সে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। কারণ, সে ছিল এক খাঁটী ভিয়েৎনামী ডিনার। ভাত, সুপ, মাছের মুড়ো, চিকেন, চড়ুই পাখির চোখ ছেঁচে তৈরী পেষ্ট, সস দিয়ে শকরের মাংস, মাছের তেল, সালাদ—

লয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জন। হায় আল্লা, কী পরিষ্কার! কী আশ্চর্য স্বাদ! সত্যি বলছি, মার্কিন খাবারের স্বাদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। (অবশ্যি এসব খাবারের উৎপত্তি আর তৈরী করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে)। ডিনারের সময় আমরা আসন-পিঁড়ি হয়ে কিংবা ডেকের বালিশগুলোর উপর গুঁড়ি মেরে বসলাম। রঙিন পাত্রে ধূপকাঠি শোভা পাচ্ছিল। কয়েকজন ভিয়েৎনামী আর ফরাসী অফিসারও ছিল সেখানে। অবশ্য রাজনীতি আর যুদ্ধসম্পর্কীয় কথাবার্তা একদম বন্ধ। উপনিবেশ আর স্বাধীন রাষ্ট্র, আমেরিকা আর ফ্রান্স, সাদা আর হলদে চামড়া, নিম্নপদস্থ আর উচ্চপদস্থ কর্মচারী—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে মাদাম গাইয়ের পার্টিতে। একবার মাদাম গাইকে অনুরোধ করলাম তাঁর এতিমখানার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে। এতিমগুলো তিনি পেলেন কোথায়? এদের খাওয়ানোর পয়সা আসছে কোত্থেকে? এরাই বা কে?

মাদাম তাঁর কাহিনী বলা শুরু করলেন। তখন তিনি যেন আর জেগে নেই, স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর দেশের অনেক মানুষের মত তার কণ্ঠে পুরনো উপকথা শোনাবার আমেজ ঘনিয়ে এলো:

"উনিশ শ' ছেচল্লিশ সাল তখন। দক্ষিণ টংকিনের খানহোয়া গ্রামে অনেকগুলো খণ্ডযুদ্ধ হয়। নানা পরিবার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। মরা পচে গ্রাম ভাপসা হয়ে ওঠে। শিশুরা রাস্তার ধারে তাদের মৃত বাপ-মা'র পাশে পড়ে মৃত্যুর দিন গুণছে। যুদ্ধের দিনে এইসব অপ-গণ্ডদের খোঁজ নেবার কেউ নেই।

"আমি তখন খানহোয়াতে বাস করছিলাম। এক সময়ে ক্যান্টনে আমাদের পরিবারই ছিল সবচেয়ে ধনী। আমার একটি চমৎকার বড় বাড়ী ছিল। চারপাশে তার কয়েক 'মনু' জমির বিস্তীর্ণ মাঠ। আমার বাড়ীর বেশ কিছু অংশ যুদ্ধে বিধ্বস্ত হলেও তখনও তার মধ্যে থাকা চলতো। আমি রাস্তার ধারে কুঁকড়ে পড়ে-থাকা ছেলেমেয়েদের এনে রাখলাম আমার বাড়ীতে। আমি আর আমার চাকর-বাকর সবাই মিলে তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে শুরু করলাম।

"কিন্তু খানহোয়াতে আবার যুদ্ধ শুরু হলে দেখলাম, বাস্তুত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে আমি বাস্তুত্যাগ করলাম। আমার গয়নাপত্র আর সোনার 'কিউব'গুলো নিয়ে কাছাকাছি এক গ্রাম নামদিনে চলে আসলাম। সেখানে একটা নতুন বাড়ী কিনলাম, আর ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থাপত্র করলাম। তাদের সংখ্যা এখন ছয় 'শয় এসে দাঁড়িয়েছে।

'উনিশ শ' উনপঞ্চাশ সালে যখন নামদিনও কম্যুনিষ্টদের হাতে চলে গেল, বাধ্য হয়ে আমাকে আবার তল্পিতল্পা গুটাতে হলো। এবার ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা এক হাজার। এইভাবে পাঁচবার জায়গা বদল করে অবশেষে হাইপঙে এসে আস্তানা গাঁড়লাম।

"শহরের মেয়র আমার ছেলেপুলেদের মাথা গুঁজবার জন্যে চমৎকার একটা দালান দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-বছরের পয়লা দিকে দিয়েনবিয়েন ফু'র পতনের ফলে আমার দালানটি ফরাসীদের হাসপাতালের জন্যে দরকার হয়ে পড়ল। তাই আমরা এখন যে বাড়ীটা দখল করে আছি, সেখানে চলে আসতে হলো। এতো সাধারণ বাড়ীতে আপনাদের আপ্যায়ন

করতে আমার লজ্জা হবার কথা। তবু এটা আমার বাড়ী ভেবে, আমি লজ্জা পাচ্ছি না। আর এভাবেই আমি আজ এক হাজার ছেলেমেয়ের মা।

"আমার স্বামী যুদ্ধ বাধার প্রথম মাসে মারা গিয়েছিলেন। আমার দু'টো ছেলে এখন ফ্রান্সে আছে। টংকিন আমি কখনো ছাড়িনি। তাই অনেকে বলে আমি ফরাসী-ঘেঁষা। আমি নাকি উপনিবেশবাদের সমর্থক, ফরাসীদের আমি ঘৃণা করি না। আমি জানি, ওরা আমাদের দেশের জন্যে অনেক ভালো কাজ করেছে। এখন যে ভাষায় আমি কথা বলছি, তাও ফরাসী।"

"কিন্তু আমাদের জনসাধারণ এখন বুঝতে পারছে না। তারা আসল জিনিসের মূল্য বোঝে না, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ করতে পারে না। তাই আজ এই দশা।"

মাদাম গাই আমাদের কাছে আগাগোড়া তাঁর কাহিনী বিবৃত করার পর আমরা ব্যাপারটি ভালো করে বুঝতে পারলাম। তবু এই দেশে অনেক কিছু রয়ে গেল, যা' বোঝা সত্যি দুঃসাধ্য।

দালানটি অত্যন্ত বাজে ধরণের। আমাদের কাজ চলার উপযোগী মনে হতো না। আসল ঘরটায় ছোট্ট দু'টো করে কামরা দুই তালায়। বিজলীবাতির (এক কামরায় একটি করে বালব) ব্যবস্থা থাকলেও পানির ব্যবস্থা ছিল না। বাড়ীটার পেছনে আরো দু'টো কোয়ার্টার ছিল। ছেলেমেয়েরা ওখানে ঘুমুতো। এক তালায় চারটি করে কামরা। প্রতিটি কামরায় কুড়িটি করে ছেলে শু'তো। তা'ছাড়া আরও কতকগুলো টিনের ছাউনীওয়ালা চারদিক খোলা বেশ বড় ঘর ছিল; অনেকগুলো কাঠের শক্ত বিছানা সেখানে। বাকী শত শত ছেলেমেয়ের শোবার জায়গা ওখানে। মৌসুমী বৃষ্টির ঝাপটা থেকে রেহাই পাবার জন্যে বর্ষাকালে ক্যানভাস দিয়ে চারদিক ঘেরাও করে দে'য়া হতো।

এতিমখানা চালানোর ব্যয় মাদাম গাইয়ের ব্যক্তিগত তহবিল থেকেই যেতো। নতুবা রহস্যময়ভাবেই তিনি সে ব্যয় বহন করতেন। ছেলে-মেয়েদের যে কাপড়-চোপড় পরতে দিতেন, ওগুলো প্রায়ই কোনো ফরাসী এডমিরাল কিংবা জেনারেলদের কাছ থেকে আদায় করে নিতেন। এখানে এডমিরাল কোয়ারভিলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে! ফরাসী নৌ-বাহিনীর এডমিরাল কোয়ারভিল উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে অনেকগুলো অতিরিক্ত নেভি ব্লু ইউনিফর্ম নিয়ে ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একবার

ফরাসী ডিনারের দাওয়াত খেতে গিয়ে মাদাম গাই কায়দা করে কিছু ইউনিফর্ম হস্তগত করেন। সেগুলো কেটে-ছেঁটে ছোটদের জন্যে স্যুট তৈরী করা হল।

ফরাসী বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসার জেনারেল রেঁনে কগনী একবার 'ভিয়েৎমীন' মালগুদাম অধিকার করেন। ওগুলো কম্যুনিষ্ট ইউনিফর্মে ভর্তি, মাদাম গাই তা শুনলেন। এর পরের ভোজসভায় সেই একই ভোজ দিয়ে মাদাম গাই এডমিরাল কোয়ারভিলের মতো জেনারেল কগনীকে বশীভূত করলেন। তার এতিমখানার কাপড়ের জন্যে আর ভাবনা হলো না।

এতিমখানাটা বেশ উন্নত। প্রতিটি ছেলেমেয়েকে তিনি ভালো-বাসতেন। অকৃত্রিম দরদ আর একনিষ্ঠতা নিয়ে তিনি ওদের দেখা-শোনা করতেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা বেশ ভালো আর ভদ্র—বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

মাদাম গাইর সঙ্গে মার্কিনদের যোগাযোগ ঘটে উনিশ শ' চুয়ান্নর আগষ্ট মাসে। এসময় হাইপঙে স্থলবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল মোহাজেরদের পুনর্বসতির ব্যাপারে সাহায্য করতে আসে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল হেমলিন এবং ইউ. এস. এম. সি'র কর্নেল ভিক্টর ক্রোজিয়াটের অধীনে সামরিক সাহায্য এবং উপদেষ্টা দলের কয়েকজন অফিসারও ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওভারসীজ মিশনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মাইকেল এডলারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলাম আমি ও আমার কর্তা ডাঃ এমবারসন। আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে মাদাম গাইয়ের বেশী সময় লাগেনি। কিংবা মাদাম গাই-ই আমাদের চোখে পড়ে গিয়ে-ছিলেন এই স্বল্প সময়ের পরিচয়ে; কোনটা আগে ঠিক মনে পড়ছে না। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। সমান মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর অগুণিত ছেলেমেয়ের মিষ্টি হাসিতে।

মাদাম গাই জাপ-আক্রমণের সময় একজন পলাতক মার্কিনকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সে ছাড়া তিনি দ্বিতীয় মার্কিনবাসীর সাক্ষাৎ পাননি ইতিপূর্বে। মাদাম গাই খুব চমৎকার ফরাসী বলতে পারতেন। ইংরেজী বলতে পারতেন শুধু একটি কথা, "ইয়েস, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।" আমরা বলতাম, এতে তেমন বৈচিত্র্য নেই আর ঠিকমতো না হলে বিপদ হতে পারে। উনি হাসতেন, ফরাসীতে বলতেন, "আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।"

ক্যাপ্টেন এমবারসন যখন হাইপঙ ত্যাগ করেন তখন তার শেষ আদেশ ছিল, "মাদাম গাইর এতিমখানার বাচ্চাদের অবহেলা করো না।" ক্যাপ্টেন এমবারসনের অসংখ্য আদেশের মধ্যে এটিই বোধ হয় আমি সব চাইতে বেশী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম।

এতিমখানায় প্রথম রুগী দেখা শুরু করেন ডাঃ এমবারসন। তারপর আমি দেখি উনিশ শ' পঞ্চান্নর এপ্রিল মাস অবধি। এরপর ওটি দক্ষিণে স্থানান্তরিত হয়। ভোজের পর অনেক সময় ফরাসীরা যখন মাদামকে নিয়ে গল্প গুজবে মশগুল থাকতো, আমি তখন আমার ব্যাগটা নিয়ে এতিমখানার সেই বড় বাড়ীটা আর তার আশেপাশের শেডগুলোতে চক্কর দিয়ে বেড়াতাম। ছেলেমেয়েদের জন্যে ধোয়া-মোছা প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেয়া সত্ত্বেও ওদের অবস্থা ভারি খারাপ। প্রকৃতপক্ষে ওদের অনেকেই ছিল নানা রোগাক্রান্ত। ওদের জন্যে আমাকে যথেষ্ট সময় খরচ করতে হতো—ব্যস্ত থাকতে হতো। তবুও সময় করে একবার করী দু'বার ছোট্ট সাথী গাইয়েনকে আদর করে আসতে হতো।

আমি এই বাচ্চাকাচ্চাদের জন্যে যুদ্ধ জাহাজগুলোতে নানা জিনিসপত্রে সরবরাহের আবেদন করেছিলাম। ওরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানাকিছু পাঠিয়ে সে আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু ভিয়েৎনামের এতিমদের জন্যে তো আমি 'নেভীদাও' খরচ করতে পারি না। কংগ্রেস যে আইন পাশ করে দিয়েছে, ওগুলো শুধু সাদা টুপিওয়ালা লোকগুলোর জন্যে। তাই ওষুধপত্র যোগাড়ের অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলো।

ইণ্ডিয়ানার ইভান্সভিলাস্থ মিড-জনসন কোং-র কাছে আবার লিখলাম; পরিচালকদের আমি এতিম বাচ্চাদের কথা লিখে জানালাম। ওদের মনে করিয়ে দিলাম, আমার ছাত্রজীবনে ওদের প্রস্তুত বিভিন্ন ভিটামিনের নমুনা মাসে একবার করে অন্ততঃ আমার কাছে পাঠাতো। এখন তাদের অনুরোধ জানালাম, ওরা যেন কিছু বেশী নমুনা পাঠায়, যাতে ছ'মাসের জন্যে ছয় শো শিশুর দৈনিক ভোজের ব্যবস্থা হয়। ওঁরা এক হাজার ছেলের এক বছরের জন্যে ভিটামিন পাঠিয়ে আমার ডাকে সাড়া দিলেন।

ছেলেদের যেমন বলা হল, তেমনি ঔষধ খেল সবাই। ওগুলো খাওয়ার শুরুতে যে মেছো স্বাদ আর পরে যে তেতো স্বাদ, এতে মার্কিন মুল্লুকের প্রতি ওরা যে ভালোবাসায় গদগদ হয়ে পড়তো, তা

মনে হয় না। কিন্তু স্বাদ যাই হোক না কেন, তাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো হতে লাগল।

ইণ্ডিয়ানার সাউথবেণ্ডে নটরডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। অনেকেই তাকে চিনতো আর ভালোবাসতো। আমিও বাদ যাই নাই। নটরডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নটরডাম ছাড়া উনিই ছিলেন আমার একমাত্র আকর্ষণ। নাম তাঁর এর্মা কোনইয়া। আনলাকের এতিমখানায় সব কিছু খুলে লিখলাম তাঁকে। এবার শুধু কাপড় ভিক্ষা করে। চিঠি পেয়ে এর্মা মাসে একটি করে প্যাকেট পাঠাতে লাগলেন। এখনো সাইগনে স্থানান্তরিত সেই এতিমখানায় তিনি এভাবে কাপড় পাঠিয়ে চলেছেন। প্রত্যেকটি প্যাকেটে থাকতো রঙ-বেরঙের টি সার্ট, কিছু ছোট মোজা, কিছু সার্ট, কিছু চিরুনি আর কিছু বাতাসা। এক সময়ে এলো বেশ কয়েক জোড়া রঙিন সাসপেণ্ডার। বাচ্চারা ওগুলোর যথাযথ ব্যবহার পছন্দ করল না, বেল্টের মতো কোমরে জড়িয়ে রাখল।

আমাদের নৌবাহিনীর কোনো জাহাজ তীরে এসে ভিড়লে ক্যাপ্টেনকে শুধোতাম তিনি ছেলেমেয়েদের একটি পার্টি পছন্দ করেন কিনা। সায় পেলে দু'টোর সময় একটা ট্রাকে করে ত্রিশ চল্লিশজন ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিতাম। এর মধ্যে কেউ ভিজে জবজবে হয়ে যেতো। আর ভীষণ গোলমাল শুরু করতো, ঘণ্টাখানেক তাদের সিনেমা দেখানো হতো। উপহার দেওয়া হতো কমিক বই। তারপর নানা খাবার-দাবার আর আইসক্রীম খাওয়ানো হতো (এতে কখনো বা তাদের পেটের অসুখও দেখা দিত)। এক-একজন নাবিককে এক-একটা করে বাচ্চা দেয়া হতো। আর বাজি রাখা হতো কার কাছে কে সবচেয়ে মউজে ছিল। সিনেমা পার্টি হয়ে গেলে ওরা নাবিকদের আনন্দ পরিবেশন করতো। ভিয়েৎনামের লোকসংগীত আর লোকনৃত্যের আসর হতো। বয়েসে যারা বড়, ওরা যাদুর খেলা দেখাতো। কখনো বা কোনো ছেলে হেসে, গর্জন করে নাবিকদের ফেলে দিতে চাইতো। সে তখন মাটিতে শুয়ে থাকতো। এতে ওরা নিরস্ত হতো। শিশুরা এভাবে নাবিকদের মন জয় করে ফিরে আসতো। তখন ওদের পেট ভর্তি আইসক্রীম, পকেট ভর্তি মিছরি, মিষ্টি; বুক ভালোবাসায় ভরা আর চোখে বিস্ময় ভরা। মাথায় আবার নাবিকদের সাদা টুপি। নাবিকরা জাপান থেকে তাদের প্রেয়সীদের জন্যে নিয়ে

যাচ্ছিল স্কার্ফ। আশ্চর্য! সব দেখি মাদাম গাইর এতিমখানায় খোকা খুকুদের গলায় ঝুলছে।

একবার এক 'এল-এস টি'তে বাচ্চাদের একটি পার্টি দেয়া হয়। ওটাতে কমোডোরের হেলিকোপ্টার থাকতো। কমোডোর তখন জরুরী কাজে হেলিকোপ্টার নিয়ে বৈদ্য এলঙে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাচ্চাদের আসার তখনো কিছু দেরী ছিল। কমোডোরকে বুঝিয়ে অপেক্ষা করানো হলো। পরে ওরা এলে হেলিকোপ্টার নিয়ে তিনি চলে গেলেন। এতে ওরা ভীষণ মজা পেল।

সকাল বেলায় আমরা যখন মোহাজেরদের জাহাজঘাটা থেকে নিয়ে আসতে যেতাম, মাদাম গাইও সেখানে আধ ডজন বয়স্ক ছেলে নিয়ে হাজির থাকতেন। ওরা মোহাজেরদের জিনিষপত্র বইয়ে দিতো, কখনো বা তাদের ছেলেমেয়েদের বয়ে নিয়ে যেত। কখনো মেয়েদের ভারী বোঝা বয়ে নিতে সাহায্য করতো। মাদাম গাই দাঁড়িয়ে মোহাজেরদের রুটি বিলি করে দিতেন। মার্কিন সাহায্য থেকে কেনা এই রুটি। কেটে ওগুলোকে স্যাণ্ডুইচ করা হতো। আমরা হাইপঙে থাকাকালে মাদাম গাই আর মাদাম কোয়ারভিলে মিলে সাত লাখের বেশী রুটি বিলি করেছিলেন।

শহরে তখন প্রায় কিছু পাওয়া যেত না। প্রয়োজনীয় কিছু বাজারে না মিললেই আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কাছে খবর পাঠাতাম। ওরা কাছাকাছি যুদ্ধজাহাজ কিংবা অন্য যে কোনো উপায়ে তা যোগাড় করে দিত।

কোনো জাহাজ থেকে আসতো মিষ্টি গুঁড়ো দুধ। কেউবা দিত মাংসের টিন। কেউবা নগদ চাঁদা। 'বলডাক' জাহাজে নাবিক ছিল এক শ' কুড়িজন। তবু বড় দিনের সময় ওরা দুশো ডলারের উপর সংগ্রহ করে দেয়। নাবিকেরা অনেক সময় বাইরে থেকে নানা জিনিষপত্তর কিনেও খোকা-খুকুদের উপহার দিতো।

বাস্তত্যাগ-পূর্বের মাঝামাঝি সময়ে নৌবাহিনীর তরফ থেকে কমোডোর সেণ্ট এঞ্জেলো ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কার্যাধ্যক্ষ। এতিমখানার প্রতি তাঁর সুনজর ছিলো। তিনি ঠিক করলেন ছেলেমেয়েদের কিছু মার্কিন খেলা-ধূলা শিক্ষা দেয়া দরকার। পিঙপঙ তিনি বেছে নিলেন। জাহাজের ছুতার মিস্ত্রি ডেকে এনে তিনি টেবিল তৈরী করালেন। তাঁর স্টাফের

একজন জুনিয়ার অফিসার দেশে স্ত্রীকে লিখে পাঠালো কিছু প্যাডল, বল আর জাল পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তারপর থেকে এতিমখানার ঝামরা পিঙপঙের টুকটাক শব্দ ও ছেলেদের উল্লাস-ধ্বনিতে সরগরম হয়ে উঠল।

মোহাজের শিবিরে কোনো গণ্ডগোল দেখা গেলে কিংবা মান্দারিনরা ঠিকমতো কাজ না করলে আমি মাদাম গাইকে গিয়ে বলতাম। তিনি তক্ষুণি আমার সঙ্গে জীপে করে চলে আসতেন। সব ঠিকঠাক করে দিয়ে তবে যেতেন।

মনে পড়ে, একবার এক পরিচ্ছন্নতার অভিযান চালিয়েছিলাম। তখন মান্দারিন-প্রধান আর অফিসাররা কয়েকটি ক্যাম্প নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়ল। মাদাম গাই তাদের সরিয়ে চড়া গলায় বল্লেন, "এই ক্যাম্প যেন এতো অপরিষ্কার আর দেখতে না হয়। ক্যাম্প পরিষ্কার করতে মার্কিন ডাক্তারকে তোমরা সহযোগিতা করছ না কেন?" ব্যস, কাজ হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত ওরা ক্যাম্প পরিষ্কার করে নিল। এরপর আমি আর নিজে কিছু না বলাই ঠিক করলাম।

মাদাম গাইয়ের কর্মপ্রেরণা ছিলো ঘোলো বছুরে মেয়ের মত। তাঁকে দেখলে মনে হতো বছর তিরিশের মহিলা। আসলে তাঁর বয়েস ছিলো ঘাটের কোটায়।

মাদাম গাইকে শুধোতাম তাঁর এতিমখানা দক্ষিণে কখন তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি জবাব দিতেন, এখনো সময় হয়নি। সত্যি সত্যি তখনো অনেক অনাথ শিশুর তাঁর আশ্রমে আশ্রয় লাভের বাকী ছিলো। তাই শেষ মুহূর্ত অবধি তিনি অবস্থান করছিলেন। এতে ফরাসী আর মার্কিন কর্তাদের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কারণ, তাঁরা জানতেন হো চি মীন উনিশ শ' পঞ্চান্নর আগেই হাইপঙ দখল করে নিতে চাইবে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি কম্যুনিষ্টদের পরিচালিত দাঙ্গা আর বিক্ষোভের ফলে সমস্ত শহরে তাণ্ডবলীলা শুরু হল। মাদাম গাই বুঝতে পারলেন, এবার তাঁর গা-তোলার সময় হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওভারসীজ মিশন সাইগনে ইতিপূর্বে সব ব্যবস্থা সমাধা করে রেখেছিল। একটা দালান ঠিক করে রাখা হয়েছে। সাইগনের মার্কিন কুলবধূ ক্লাব (এমেরিক্যাল ওয়াইভ্স্ ক্লাব) এই মহীয়সী মহিলাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। ক্লাবের সদস্যগণ তাঁদের

হাইপঙ প্রত্যাগত স্বামীর কাছ থেকে মাদাম আর তাঁর অনাথ শিশুদের সম্পর্কে যথেষ্ট শুনেছিলেন।

তাই এপ্রিলের মাঝামাঝি এতিমখানাটি সমস্ত জিনিসপত্র সমেত হাইপঙ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। বিছানা, মাদুর, বাসন-কোশণ, ছোট সেলাইয়ের কল, চা'ল, কম্বল, ভিটামিন পিল, কৃত্রিম পা, পিঙপঙ টেবিল, প্রভৃতি কিছুই বাদ যায়নি। তখন এতিমখানায় আশ্রিত ছেলেমেয়ের সংখ্যা আট শো।

কমোডোর সেণ্ট এঞ্জেলো আমাকে বললেন, ওরা সব দিকে বন্দোবস্ত পেলো কিনা, তা দেখার জন্যে বেকারকে পাঠাতে। এক হপ্তা আমাকে খুব অসুবিধায় রেখে বেকার ফিরে এলো। খুব সকালে ওরা যেদিন চলে যাচ্ছিল, এডমিরাল কোয়ার ভিলে নিজে দাঁড়িয়ে সব তদারক করছিলেন। রেড রিভারে তখনো সূর্যোদয় হয়নি। অযুত শিশু স্বাধীনতার পথে পাড়ি দিচ্ছিল, 'জেনারেল ব্রিউষ্টার' জাহাজে চড়ে। দু'দিন তিন রাত্রি জাহাজে কাটানোর পর ওরা সাইগনে পৌঁছল। সেখানে মার্কিন কুলবধূ ক্লাব ওদের সম্বর্ধনা জানিয়ে নিয়ে গেল নতন নিরাপদ ভবনে। এদিকে হাইপঙে মাদাম গাইর মার্কিন 'অনাথ'দের অবস্থা কাহিল! তাঁর কথা আমাদের বারবার মনে পড়ছিল। সহসা তাঁর অভাবে বড্ড নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল।

মাদাম গাই তাঁর এলাকা ছেড়ে কখনো বাইরে যাননি ইতিপূর্বে। এখন যে যেতে হলো, সে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত দুঃখও বটে। তিনি প্রায়ই বলতেন, টংকিন আবার আমাদের হাতে ফিরে আসবে। বলতেন, "আমরা টংকিনবাসীরা সামরিক জাতি। অনেকটা আপনাদের টেক্সাসবাসীদের মতো। আমরা জানি, একদিন ভিয়েৎমীন'দের হাত থেকে এদেশ আমরা পুনরুদ্ধার করবোই। কোনো সন্দেহ নেই এতে।"

যে জাতিতে এমন মহিলার জন্ম, সাময়িক গণ্ডগোল সত্ত্বেও সে জাতির আশা, উদ্দীপনা অনির্বান।

ভিয়েৎনামের ছেলেরা বেশ ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল। বড়োদের মতো ওদের ভিতরও স্থৈয, গাম্ভীর্য দেখা যেতো। কখনো বা চূড়ান্ত সাহসের পরিচয় দিতেও ওরা দ্বিধা করতো না।

বেশ কিছু সংখ্যক বাচ্চা ছেলে আমাদের ক্যাম্পে কাজ করতো। মাসের পর মাস ওরা আমাদের সঙ্গে ছিল। বড়োদের কাজকম করতো। বড়োদের মতো সিগারেটও খেতো। বয়েস আর কতো, আট থেকে বারো, এরি মধ্যে ওরা এমনি পাকা! আমার ফোরম্যানদের অধীনে এ ধরণের ছ'সাতজন করে সহকর্মী থাকতো। তাদের সম্মানসূচক নিদর্শন হচ্ছে নাবিকদের সাদা টুপি। ওদের বেশ বড় একটা দল আমার পেছনে দিনরাত ঘুরঘুর করতো। কখনো কখনো বড্ড অসুবিধার সৃষ্টি করতো। কখনো আমাকে টেনে নিয়ে দেখাতো কোথায় কোন বুড়ি তাঁবু ছেড়ে বাইরে যেতে পারছে না, কোন খোঁড়া তার পা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। আমি কোনো কাজে পাঠালে এক দৌড়ে তা করে আসতো। কোনো জিনিষের জন্যে পাঠালে যেখানেই পাক খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতো। রুগী দেখার জন্যে গরম পানি তৈরী করা, কখনো আমার কাপড় চোপড় ধুয়ে দেওয়া—এসব কাজও ওরা করতো। কিন্তু ময়লা পানিতে ধুয়ে কাপড় নষ্ট করতো বলে আমি ও কাজে আর তাদের উৎসাহ দিতাম না। একটা সখ অবশ্য ওরা আদায় করে ট্রাকে চড়ে কখনো ফূর্তি করা। ছেলেমেয়েরা এসব ছাড়তো, সে হল, আব্দার করেই থাকে, তাই তাতে আমি বাধা দিতাম না।

হাইপঙের হোটেলগুলোয় থাকবার সময় ওরা আমার দরোজার বাইরে শুয়ে থাকতো। বাস্তত্যাগীদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিল ওরাই। মিঃ হাম কিংবা অন্য কোন ভিয়েৎনামী অফিসার আমার কাছে এসেই এসব নেভীক্যাপ পরা ছেলেদের একজনকে বলতেন, "ব্যাকসী মাইকো সালাম দাও।" আমাদের কোনো সহকারী দক্ষিণে চলে গেলে আমরা ছোটো-খাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। অনেকগুলো যুদ্ধ জাহাজ থেকে লাল পানির ব্যবস্থা হতো। তখন এই ছেলেদের উপর ওগুলো

সরবরাহ করবার ভার দিতাম। তাতে ওরা ভারি খুশি হতো। আমি আশা করি, নৌবাহিনীর ব্যক্তিগত বিভাগ আমার এই অস্বাভাবিক নিয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

ভিয়েৎমীন কম্যুনিষ্টরা তাদের প্রচারকার্য বেশী করে চালাচ্ছিল ছোট ছেলেমেয়ে আর তরুণদের মধ্যে। এই প্রচারণা চালাতে গিয়ে ওরা অনেকগুলো অবিশ্বাস্য কাণ্ড-কীর্তি করেছিল। প্রথম ডিসেম্বর মাসে আমি কম্যুনিষ্ট 'উচিত শিক্ষা' প্রত্যক্ষ করি। এমন ঘৃণ্য কাজ আর কখনো হতে শুনিনি।

হাইদোঙে তখন ওদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার কম্যুনিষ্টরা এল গ্রামের স্কুল পরিদর্শন করতে। সাতজন ছেলেকে ক্লাশ থেকে বার করে মাঠে এনে রাখা হল। মাঠের উপর বসিয়ে তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা হল। তারপর এক যুবক শিক্ষকের পালা। তাঁরও একই দশা হল। এবার নতুন ক্লাশ শুরু হলো। ছাত্ররা সবাই শুনতে পায় তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হল। একজন 'দেশপ্রেমিক' পুলিশকে জানিয়েছে, এই শিক্ষক রাত্রে গোপনে ধর্মবিষয়ক ক্লাশ নিতো। প্রশ্নোত্তরে ধর্ম শিক্ষা চলতো। এই সাতজন ছেলে শিক্ষা গ্রহণ করছিল। শাস্তিস্বরূপ তাদের শ্রবণ শক্তি রহিত করা বাঞ্ছনীয়। এই মন্দ শিক্ষা আর যাতে ওদের কানে না ঢোকে, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর দু'জন গার্ড এসে একটা ছেলের মাথা চেপে ধরল শক্ত করে। আরেকজন একটা কাঠের চপষ্টিক ঢুকিয়ে দিলো কানের ভিতর। সমস্ত শক্তি দিয়ে ছিদ্রপথে ঢুকিয়ে সে কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলল। ছেলেটি চীৎকার দিয়ে সমস্ত পাড়া মাথায় করল। সব ক'টি ছেলেকে একই শাস্তি দেয়া হল। চীৎকার, ধ্বস্তাধ্বস্তি অনেক কিছুই ওরা করল। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। অনেক নাড়াচাড়া করে কানের মধ্যে গেঁথে দেয়া শলাকাটা ফেলে দিল শুধু।

শিক্ষকের বেলায় শুরু হল নতুন শাস্তি। তাঁর শিক্ষাদান কার্য চিরতরে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা হল। প্রথমে তাঁকে তার ছাত্রদের উপর প্রদত্ত নৃশংস শাস্তিদান পর্বের দর্শক হতে হল। কিন্তু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল আরো গুরুতর ব্যবস্থা। একজন সৈন্য গিয়ে জোরে তাঁর মাথা চেপে ধরল। আরেকজন তাঁর জিব বের করে সাঁড়াশী দিয়ে ধরে রাখল। আরেকজন তার বেয়নেট নিয়ে জিবের অগ্রভাগ কেটে

ফেলল। রক্তস্রোতে সমস্ত অঙ্গণ ভরে উঠল। কোনো চীৎকারও তিনি করতে পারলেন না। গলা দিয়ে শুধু রক্ত বেরুতে লাগল। সৈন্যরা তাকে ছেড়ে দিলে উঠোনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। সমস্তটায় তখন রক্তের প্লাবন বয়ে গেছে। তবু শিক্ষক কিংবা ছাত্র কেউ ওরা মরেনি। এই বীভৎস অত্যাচারের খবর ব্যাম্বু কারটেইন পেরিয়ে বাইরে এলেই ওদের বাস্তত্যাগের ব্যবস্থা করা হলো। শিক্ষক এবং ছাত্রগণ 'ক্যাম্প দ্য লা পেগোদার' এক'শো ত্রিশ নম্বর তাঁবুতে এসে পৌছলেন। যদিও জানি, খুব ভালোরকমে চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না, তবু আমরা চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। শিক্ষকের জিবের বিশেষ যত্ন নিলাম। যথেষ্ট রক্ত ক্ষয়ে ওর অবস্থা কাহিল। আমাদের কাছে আবার রক্ত দেবার যন্ত্রপাতি ছিল না। মুখ দিয়েই তরল কিছু খাইয়ে দিলাম। ভাত কিংবা অন্য কিছু খাওয়া তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর ছেলেদের ব্যাপারে তখন সবচেয়ে বড় করণীয় ছিল প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। তাদের জন্যে পেনিসিলিনের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাদের শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে দেয়া গেল না।

প্রাচ্যের কোনো বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা কিংবা কাউকে দুর্বল করা এই কাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে কিংবা কোরিয়ার যুদ্ধ থেকেও আমরা এ ধরণের অনেক কিছু শুনে আসছি। আমি শুধু দেখতে চাই, এই এলাকার মানুষের জীবনে কী দুর্বিপাক নেমে এসেছিল। আর হাইপঙ থেকে যে সব নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ জেনেছি, তা লিপিবদ্ধ করে রাখাও সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত বলে আমি মনে করি।

বড়দিনের তখনো কিছু দেরী ছিল। একদা মধ্য রাত্রিতে ঘুমুচ্ছিলাম হোটেলে। হঠাৎ দরোজায় করাঘাত শুনে জেগে উঠলাম। দু'টি ছেলে আমাকে বললে, আমার কোনো অসুবিধা না হলে এক্ষুণি যেন তাদের সঙ্গে যাই। আমি মনে করলাম, ওরা ক্যাম্প থেকে এসেছে এবং ক্যাম্পে নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে আমার এক্ষুণি যাওয়া দরকার। তাই তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে গাড়িতে উঠে বসলাম। ক্যাম্পের রাস্তা ধরতেই ছেলে দুটি চীৎকার করে উঠল। ওরা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে যে সড়ক চলে গেছে, সেদিকে যাবার জন্যে নির্দেশ দিল। ব্যাপার কী বুঝতে পারলাম না। তবু ওদের ঐকান্তিকতা দেখে ওদিকে এগিয়ে

চললাম। কয়েক শো গজ যেতেই চোখে পড়ল একটি ছোট্ট বাড়ি। নীচু দরোজা দিয়ে ঢুকতেই মাথা অনেকখানি নত করতে হল। ঢুকেই প্রথমে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করলাম। প্রথমতঃ, ঘরের সীমাহীন অন্ধকার আর অস্বাভাবিক প্রশস্ততা। ঘরের এক পাশে কেরোসিনের লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। আর তারই পাশে এক বৃদ্ধ দম্পতি আর কয়েকজন ছেলে-মেয়ে নীচু স্বরে প্রার্থনা করছে। ওরা প্রাচ্য প্রথায় মাথা নত করে, "চাও ওঙ, ব্যাক সী মাই" বলে আমাকে অভ্যর্থনা করলে। তারপর দেখলাম ঘরের একপাশে একটি লোক খড়ের গদীর উপর শুয়ে আছে। ওর মুখ বেদনায় বিকৃত। ঠোঁটটি নিশ্চুপে নড়ছিল একটু একটু। বোধ হয় প্রার্থনা করছিল। সত্যি তাই করছিল সে। গায়ের কম্বলটা আমি তুলে নিলাম। ওর শরীরের সমস্ত মাংসপিণ্ডে কালশিরার দাগ। পেটটা স্ফীত আর বেশ শক্ত। অণ্ডকোষ ফুলে ফুটবলের মতো হয়েছে। উরু বিশ্রী ভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। এরকম বিকট দৃশ্য আর কখনো আমি দেখিনি। এই লোককে শুধু স্পর্শ করাও বিরক্তিকর। আমার ভীষণ বমি-ভাব হলো। অসুস্থ হয়ে পড়ছি দেখে আমি বেরিয়ে এলাম। উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে বমি করলাম। ভাগ্যিস, কেউ আমার পেছন ধাওয়া করেনি। ওরা বুঝতে পেরেছিল সব। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিল। সেই ঘরের মধ্যে আমি যা দেখেছিলাম, তাকে সাংঘাতিক জখম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। জানি না, কতক্ষণ এভাবে বাইরে ছিলাম। স্নায়ুতে সম্বিত ও শক্তি ফিরে পেলে আবার ভেতরে ফিরে গেলাম। জান্তব বিভীষিকার চিকিৎসায় লেগে গেলাম। কিন্তু আমি কি করতে পারি? ওর ব্যথা উপশমের জন্যে মরফিয়া দিতে পারি। চামড়া চার-পাঁচ জায়গায় বেশী কেটে যায় নি, তাই পেটের জন্যেও বেশী কিছু করতে পারি না। তরল পদার্থ বের করে দেবার জন্যে অণ্ডকোষের মধ্যে বড় একটা ছুঁচ ঢুকিয়ে দিলাম। পরে রুগী যাতে প্রস্রাব করতে পারে তার জন্যে মূত্রাশয়ের মধ্যে কেথেটার ঢুকিয়ে দিলাম। আমার কী আর করা সম্ভব?

বুড়ো ভদ্রমহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম, খোদার রাজ্যে কে এই হতভাগাটির এ দশা করল! তিনি আমায় সব বল্লেন। লোকটি ওঁরই ভাই। উনি একজন ধর্মযাজক। 'ব্যাম্বু কারটেইনের' অন্য দিকে ভিনবাত এলাকায় ওঁর যজমানি। হাইপঙ থেকে ভিনবাতের দূরত্ব দশ কিলোমিটারের

বেশী হবে না। কম্যুনিষ্টরা ঐ এলাকার অধিকার পেয়েছে মাস-সাতেকের বেশী হবে না। তাই ওরা ওখানকার জীবন-ধারা সম্পূর্ণ বদলিয়ে দিতে পারেনি কখনো। সুতরাং যাজকদের ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করবার অধিকার দেয়া হয়েছিল। তবে তা শুধু সকাল ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত। এই সময়ে চাষীরা আবার কৃষি কার্য শুরু করবার তোড়জোড় করতে থাকে। তাছাড়া কম্যুনিষ্ট শাসন শুরু হবার পর থেকে এসময়টায় তাদের সবাইকে গ্রামের চৌমাথায় জমায়েৎ হয়ে 'নতুন জীবনের' মহিমা সম্পর্কে দৈনিক বক্তৃতা শুনতে হয়। এ জন্যে ওরা দৈনন্দিন কিংবা রবিবাসরীয় কোনো প্রার্থনা সভায় শামিল হতে পারে না। তাই স্বল্প কয়জন ধর্মপ্রাণ লোকের জন্যে এই সাহসী যাজক সন্ধ্যে বেলায় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। কম্যুনিষ্টরা সাব্যস্ত করলো, এর 'উচিত শিক্ষার প্রয়োজন।

গতরাত্রে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট সৈন্য গিয়ে যাজকের ভজনগৃহে হাজির হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গোপন সভা আহ্বানের অভিযোগ আনল। উপেক্ষা ভরে তিনি জবাব দিলেন, খোদার বাণী প্রচারে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। তাই ওরা তাঁর এ দশা ঘটাল। ছাদের কড়িকাঠের সঙ্গে পা বেঁধে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখল। তাঁকে বেশ নীচু করে মেঝের কাছাকাছি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে তিনি বলেছিলেন, সব সময় মেঝেয় হাত দিয়ে আমি পায়ের চাপ কমাতাম। এভাবে ঝুলিয়ে, শক্ত বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তাঁর 'ভূত' ছাড়াবার ব্যবস্থা করতেও ওরা বাকি রাখেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে অত্যাচার চলল। কতক্ষণ চলেছিল তাঁর জানা নেই। কারণ তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েছিলেন ইতিমধ্যে। তাঁর শরীর বেদনায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে তাঁকে সারারাত ঝুলিয়ে রাখা হল। পরদিন সকালে গির্জার ছেলেরা দেখে অতি কষ্টে নামিয়ে রাখে। ওদের বয়স আট থেকে দশের মধ্যে। ওরা ছুটে গেল বাবা মা'র কাছে। গ্রামের চৌমাথায় ওরা তখন বক্তৃতা শুনছিলো। কেঁদে কেঁদে খবরটা ওদের দিল। ওরা ছেলেদের কী করতে হবে, বলে দিয়ে বিদায় করলো। ওরা জানতো, এই বিদায় হয়তো শেষ বিদায়। ছেলেরা এসে বাঁশের একটা ছই তৈরী করল। তার ওপর পুরোহিতকে বসিয়ে গ্রামের পেছন দিককার চোরাপথ দিয়ে নিয়ে চলল। নদীর ধারে স্বাধীন এলাকার সীমান্তে এসে গোপন করে রাখল। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া ওঁর জন্যে আমার ঔষধের

চাইতেও কাজ দিয়েছিল। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে ওরা বর্ডার পার করিয়ে নিয়ে এল তার বোনের বাড়ি। তারপর আমাকে এখানে তুলে নিয়ে আসে। এরপর রোজ আমি ওখানে যেতাম। কিছু মরফিয়া আর এ্যান্টি বাইওটিক সেবন করতে দিই। আশ্চর্য রকমভাবে তিনি সেরে উঠতে লাগলেন। তাঁর শক্ত গড়নের শরীর আর অন্তরের ঈমানের জোর হয় তো তাঁকে এত দ্রুত সুস্থ করে তুলছিল। আরো কিছু সুস্থ হলে তাঁকে আমি ক্যাম্প দ্য লা প্যাগোদা'য় নিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম। হাঁটতে তিনি পারতেন না। হাঁটতে গেলে খোঁড়াতে হতো। তবু দৈনিক প্রার্থনা সভা আর প্রশ্নোত্তরে ধর্মালোচনার অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্যাম্পে আসায় তাঁকে নিয়মিত পুরোহিত পদে অভিষিক্ত করেছিলাম।

হয়তো আমার তাঁকে যেতে দেয়া উচিত ছিলো। তিনি সেই গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে যে রকম জেদ ধরেছিলেন, তাতে তাঁকে ধরে রাখা হয়তো আমার অন্যায়ই হয়েছে! কিন্তু আমি জানতাম, কম্যুনিষ্টরা এবার তাঁকে পেলে আর জ্যান্ত রাখবে না। অবশ্য পৃথিবীতে শহীদের রক্তদান বৃথা যায় না। কিন্তু টংকিন এলাকা যে বহু শহীদের পবিত্র রক্তে স্নাত হয়ে গেছে, তাই আর একটি শহীদের সংখ্যা বাড়িয়ে কী লাভ!

আমি জানি, কয়েকজনের কাজের নজীর থেকে একটা গোটা সমাজ-ব্যবস্থার বিচার ন্যায়সংগত নয়। তবু, এই আমার কাছে কম্যুনিজমের স্বরূপ! তবু এই দানবরাই আজ প্রাচ্যের বেশীর ভাগ অংশ দখল করে বসে আছে। সমস্ত মানবজাতির প্রায় অর্ধেক আজ তার সঙ্গে। ডিসেম্বর থেকে শুরু করে শেষ দিন অবধি এরকম দু'চারটে ভয়াবহ ঘটনা আমার এলাকায় ঘটতো। আর 'নাইটকলে' গিয়ে আমি একটার চাইতে একটা ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতাম।

আমার হাইপঙ বাসের প্রথম দিকে আমি এ ধরণের ঘটনা প্রবাহে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়, কম্যুনিষ্ট নৃশংসতার বৈচিত্র্য দেখে। আর প্রায়ই-দেখা যেত, প্রত্যেকটির সঙ্গে কোনো-না কোনো ধর্মীয় ব্যাপার যুক্ত আছে। পরে পরে আরও বুঝতে পারলাম, মানুষের খোদাভক্তির জন্যে ওদের শাস্তির কী বহর আর বীভৎসতা!

পুরোহিতরাই ছিলেন কম্যুনিষ্ট অত্যাচারের সবচেয়ে বড় বলি। কারণ, ওঁরা কখনো 'হক টেপ ডান চু', তাদের 'গণতান্ত্রিক শিক্ষা আর তার

ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষালাভ করেননি। তাই ওঁদের আচ্ছা করে 'উচিত-শিক্ষা' দেওয়া প্রয়োজন অন্যদের চাইতেও জোরদার করে। খোদার প্রতি তাঁদের যে ঐকান্তিক বিশ্বাস তা থেকে তাঁদের বিচ্যুত করা অনেকটা অসম্ভব ছিল। তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন তাই অপরাজেয়।

ক্যাথলিকদের অনেকগুলো পবিত্র-মন্ত্র ছিল। ওঁরা সব সময় কিছু-না কিছু মন্ত্র আওড়াতেন। যেমন, "জেসাস, মেরী, জোশেফ" কিংবা "প্রভু, আমাদের 'পর রহম কোরো", কম্যুনিষ্টরা ঘোষণা জারী করল এসব মন্ত্র উচ্চারণ চলবে না। তার বদলে শ্লোগান করতে হবে, "তাঙ গাই মান উ ক্লোয়াট (পণ্য বাড়াও)", "দিয়েন ট্র্যান হাঁন (জনযুদ্ধের জয়)।" আর একটা কথা খুব ঘন ঘন শোনা যেতো, "কোম থু (মুর্দাবাদ)।"

উৎপীড়নের বিভিন্ন পন্থা কম্যুনিষ্টরা ভালো রকমে রপ্ত করেছিল। শরীর, মন দু' দিকেই যাতে সমান আঘাত পড়ে, তার দিকে নজর ছিল। বর্ষার পর বসন্ত এল টংকিনে। ভাবলাম, এবার বুঝি ভয়াবহ ঘটনার নিবৃত্তি হবে কিছু। কিন্তু ভুল ভেবেছিলাম আমি। মার্চের প্রথম রোববারেই ফিলিপাইন ক্যাথলিক মিশনের ফাদার লোপেজ ডেকে পাঠালেন। 'ভিয়েৎমীন'দের খপ্পর থেকে এসেছে নতুন এক পুরোহিত তাঁকে দেখতে হবে। বেশ বড় উঠোন পেরিয়ে সেই দালানে ঢুকলাম। পেছনের দিকের একটি কামরার মেঝের উপর খড়ের বিছানায় শোয়া একটি লোক। মাথার চারদিক ফুলে, ফেটে গেছে। পুঁজ ভর্তি। জিগ্যেস না করেই ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলাম। এই হতভাগ্য পুরোহিতও নিশ্চয়ই 'রাষ্ট্রদ্রোহ' প্রচারণার অজুহাতে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা তাঁদের ভাষায় যাকে বলে 'কাঁটার মুকুট' তাই পরিয়েছিল তাঁকে। একদিন যাঁর কথা তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁকেও পরানো হয়েছিল জোর করে তাই। যা হোক, পুরোহিতের মাথায় সবশুদ্ধ আটটি ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়া হয়েছিল। সামনে তিনটি, পেছনে দুটি আর মাঝখানে তিনটি। ছুঁচগুলো বেশ বড় বড়। প্রত্যেকটি প্রায় খুলির হাড় ভেদ করে গিয়েছিল। এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড করবার পর ওরা সবাই চলে গেল। পুরোহিত রইলেন একা। অতি কষ্টে তিনি গির্জা থেকে পাশের এক কুটীরে গেলেন। এখানে ওরা মাথা থেকে ছুঁচগুলো তুলে ফেলে। তারপর তাঁকে হাইপঙে

নিয়ে আসা হয়। এখন দুদিন পর, তাঁর ক্ষতের 'ইনফেকশান' দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমি ভালো করে তাঁর মাথার খুলি ধুয়ে দিলাম। তারপর ছিদ্রপথ টেনে ভালো করে পুঁজ বের করে নিলাম। তারপর বেশ করে পেনিসিলিন আর টিটানাস অক্সাইড দিলাম। রোজ মিশনে গিয়ে দেখে আসতাম। বুড়ো পুরোহিত ভালো হয়ে উঠলেন শীগগির। একদিন তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখি নেই। কাদার লোপেজকে শুধোলাম। জানলাম, উনি আবার সেই 'ব্যাম্বু কারটেইনে' ফিরে গেছেন। অধিকতর উৎপীড়ন নিশ্চিত তবু গেলেন। আশ্চর্য! জানিনে, এখন তাঁর কী দশা!

শুধু পুরোহিতরাই যে ওদের পাশবযজ্ঞের বলি ছিল তা নয়। বুড়ো স্ত্রী-লোক পর্যন্ত ওদের খপ্পর থেকে বাদ যায়নি। একদিন ক্যাম্পে রুগী দেখতে কামরায় গিয়ে দেখি এ ধরনের এক বুড়ি। তার কাঁধ দুটো ৪-এর মতো বাঁধা। কাঁধের হাড়টা ভাঙ্গা। তাঁবুতে যেতে যেতে তিনি বললেন, উনি যখন দেশ ছেড়ে চলে আসছিলেন, তখন একজন 'ভিয়েৎমীন' রক্ষী তাঁকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর কাঁধ ভেঙ্গে যায়। ভীষণ বেদনা হয়। তবু তিনি পালিয়ে আসেন। পরে আমাদের সুচিকিৎসা আর ঔষধের গুণে ভালো হয়ে উঠেন।

এঁদের দেখে-শুনে একটা ভাবনা সব সময় মনে আসতো, হায় আল্লাহ! এতো লোক যে এলো এতো বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে, সে রকম আরো শত-সহস্র লোক তো পড়ে রইলো ওখানে, তাদের কী দশা!

একদিন রুগী দেখার তাঁবুতে দেখি বসে আছে এক যুবক। তার বুড়ো আঙুল দুটোর বর্ণান্তর ঘটেছে। আগাগোড়া একদম কালো। তার হাতে শুকনো ধরণের পচন ধরেছিল। এগুলোকে বলা হয়, মামমি ফিকেশান। এতে তেমন কোনো ব্যথা নেই, রক্ত থাকে না, শুধু হাড়-পেশীর পচন ধরে ভেতর থেকে। সে বলেছিল, তাকে তার বুড়ো আঙুলের ওপর বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। হপ্তাখানেক আগেই তার ওপর এই 'উচিত-শিক্ষার' কাজটা সমাধা হয়েছে। এর পর থেকে তার বুড়ো আঙুল দুটো একটু একটু করে কালো হতে থাকে। এখানে-সেখানে একটু গন্ধ করতে শুরু করে। পরীক্ষা করবার সময় বাম হাতের বুড়ো আঙুল থেকে কিছু অংশ ভেঙ্গে আমার হাতে চলে আসে। কোনো রক্তপাত

হল না। কোনো ব্যথাও সে অনুভব করল না। শুধু আঙুলের কিছু অংশ আমার হাতে রয়ে গেল। এই শুষ্ক মাংসপিণ্ড যেন কোনো মমীর। একটু চাপ দিতেই ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল। তার আঙুলে দীর্ঘকালের জন্যে রক্ত চলাচল বন্ধ ছিল। সে বলেছিল, তাকে কয়েকদিন ধরে ওভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আঙুলের যেখানটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, ঠিক সেখান থেকে ওপরের অংশ পঁচে ভস্ম হয়ে যায়।

বয়স্ক একজন আমায় বললে "কিন্তু বন্ধু মনে রেখো, এই গোঁড়া ধর্মপাগল মানুষগুলোকে এভাবে অত্যাচার না করলে ওরা উত্তর দেশ ছেড়ে কক্ষণো আসতো না।" জানি, সে ঠিকই বলছে। মোহাজেরদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনেক ছিল। কিন্তু প্রার্থনা-সভায় গিয়ে দেখি শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ মোহাজের হল ক্যাথলিক। ভিয়েৎনামের বিশ লক্ষ ক্যাথলিকের সাড়ে সতেরো লক্ষ বাস করতো উত্তর প্রদেশে। তারপর কম্যুনিষ্টরা এলো তাদের সংস্কার-কর্মের লোভ দেখিয়ে। বসাল নানা ট্যাক্স। শস্যের ভাগ নিল। জোর করে শ্রমিক খাটাল, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিল। তবুও হয়তো ওরা সহ্য করে যেতো। কিন্তু যখন আল্লার উপাসনায় বাধা পড়তে লাগলো, নানা পাশবিক উপায়ে তাদের সে অধিকার ওরা ছিনিয়ে নিলো, তখন ওরা বুঝতে পারল এবার আর বাস্তুত্যাগ না করে উপায় নেই।

"কী বোকা এই 'ভিয়েৎমীন' কম্যুনিষ্টরা," সেই বয়স্ক লোকটা আমাকে বলল, "ওরা ওদের ওখানে বসবাস করার জন্যে কতো লোভ দেখাল, কতো মিথ্যা বলল। বর্ডারের দিকে বাধাও দিল। কিন্তু ওদের কৃতকার্যের জন্যে যে ওরা দেশত্যাগ করছে, সেটা বোঝে না। সব খোদার মর্জি।"

'বর্ডারের দিকে মোহাজেরদের কম্যুনিষ্টরা বাধাও দিল'—এটা অবশ্যি ব্যাপারটাকে খুব হালকা করে বলা। জেনেভা চুক্তি অনুসারে উত্তরের যে-কোনো লোক ইচ্ছা করলে দক্ষিণে চলে আসতে পারে, কিন্তু কম্যুনিষ্টরা চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকে এই শর্ত ভাঙ্গতে শুরু করে। বলেছি, ওরা চালাকি, ভয় প্রদর্শন, এমন কি খুন-জখম করে পর্যন্ত তাদের প্রজাদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান বন্ধ করবার চেষ্টা চালায়।

প্রধানমন্ত্রী দিয়েম সাইগনে উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের বাইশে জানুয়ারী বলেন, "স্বাধীন বিশ্ব এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে তুলে ধরা আমার কর্তব্য যে, কম্যুনিষ্ট এলাকা থেকে যে সব ভিয়েৎনামবাসী চলে আসতে চাচ্ছে, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আর বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এতে করে ওরা জেনেভা চুক্তির বরখেলাপ করছে।"

প্রধানমন্ত্রীর হিসেব মতো ওদের হয়রানি আর অত্যাচার না থাকলে আরো আড়াই লাখ লোক বাস্তুত্যাগ করতো। আমার ধারণা, সংখ্যাটা এর দ্বিগুণ করলেও খুব বেশী হতো না। যে সব ভাগ্যবান আহত হয়ে, অসুস্থ হয়ে আমাদের ক্যাম্পে এসেছিলো, তাদের দেখলেই বোঝা যায় আরো কতো আসতে পারতো। এটা সহজেই বোঝা যায়, স্বাধীনতার আলো-বাতাসে বাঁচতে চায় এরকম আরো অযুত লোক সেখানে ছিলো, যারা শক্তি ও ঝুঁকি নেবার সাহসের অভাবে পাড়ি জমাতে পারেনি।

ভিয়েৎনামবাসীদের উত্তর এলাকায় রেখে দেবার জন্যে কম্যুনিষ্টরা কম ফন্দী আঁটেনি। ওরা ট্রেনে কিংবা বাসে এক পরিবারের একাধিক ব্যক্তির ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। সীমান্ত এলাকায় দুজন একসঙ্গে হেঁটে যেতেও পারতো না। এতে অনেকের মোহাজের হওয়া সম্ভব হয়নি। বিরাট পরিবারের বন্ধনে ওরা আবদ্ধ, তা ছিন্ন করে কি করে? তবু অনেক বেপরোয়া লোক তাদের ছেলেমেয়েদের দুজন আজ, দুজন কাল, এভাবে পাঠিয়ে দিলে মার্কিন ক্যাম্পের দিকে। অনেক সময় দেখতাম, দু'একজন করে অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে বিষন্নমুখে ক্যাম্পের বাইরে অপেক্ষা করতো। অপেক্ষা করতো তাদের বাবা মা'র জন্যে। কোনো কোনো সময় ওঁরা হয়তো এসে পড়তে পারতেন, কিন্তু বেশীর ভাগই ওদের বৃথা অপেক্ষা করতে হতো।

টংকিনের অনেক এলাকায় কম্যুনিষ্টরা স্পেশাল পাশপোর্টের ব্যবস্থা করেছিল। দেশত্যাগের জন্যে নয়, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাবার জন্যেও। এই পাশপোর্ট পেতে প্রথম রয়েছে নানা রকমের ফি, তারপর লালফিতার দৌরাত্ম্য। কিন্তু এগুলো ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর পাশপোর্ট পাওয়া গেলে, কোনো পরিবার রওনা হলো হাইপঙের পথে। পনেরো-ষোলো দিন পর ওদের খাবার গেল ফুরিয়ে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় একসায় হয়ে ওরা এসে পৌঁছুল ক্যাণ্টন এলাকায়। কম্যুনিষ্ট রক্ষী কাগজ-পত্র দেখে হেসে উঠতো, বলতো—"কমরেড, পাশপোর্টের মেয়াদ মাত্র চৌদ্দ দিন। জান না তা? ও, তুমি পড়তে পারো না। থাক, যাও, ফিরে গিয়ে নতুন পাশপোর্ট নিয়ে এসো।"

যুদ্ধের পর রাস্তার ধারে নানা কামান ও অন্যান্য মারণাস্ত্র পড়ে ছিল। বিজয়ী কম্যুনিষ্টরা সেগুলো ঝোপ-ঝাড়ের পাশে, ধানখেতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে ছিল। যখন-তখন সেগুলোর মহড়া চলত না। কেউ রাত্রিতে স্বাধীনতার পথে পাড়ি দিতে চাইলে ঠিক মতো শিকার হ'তো। অথচ জেনেভা চুক্তির সেই শর্তে স্পষ্ট লেখা রয়েছে:

"কোনো নাগরিক এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যেতে চাইলে, যে এলাকার সে বাশিন্দা সে এলাকার কর্তৃপক্ষ তাকে অনুমতি দিতে এবং সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।"

সাহায্য করতে বাধ্য! হ্যাঁ, তা-ই বটে!

হাইপঙে ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম থেকে জাগাবার জন্যে ব্যাণ্ড বাজানো হতো। ঠাণ্ডা পানির বেসিনে 'শেভ' করে নিতাম। ক্যাম্প থেকে নেয়া ক্লোরিনেটেড পানিতে দাঁত মেজে নিতাম। তারপর সাজগোজ। সব মিলে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। আমার কাজে যাবার কাপড় (সব-দিনই অবশ্য কাজ থাকে কোনো ছুটি-ছাটা নেই) খালি ট্রাউজার কিংবা সর্ট, একটি টি-সার্ট অথবা স্লীভ-হীন ইউনিয়ান সার্ট। কলারে আমার বিশেষ পদকগুলো আর নেভী হ্যাট-টা লাগাতে কখনো ভুলতাম না। ওগুলো, বিশেষ করে হ্যাট-টা খুবই দরকারী। আর পদকের মূল্যও এই প্রাচ্য দেশে কম না। আমার কলারের পদক, টুপীর মাথার 'ঈগল' প্রভৃতি শত-সহস্র মোহাজেরের কাছে আমি যে তাদের কর্তৃপক্ষ বিশেষ তারই চিহ্ন—সাত সাগরের পারে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের স্মারক। আমি ও আমার ফোরম্যানরা একটা ব্যাপারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমরা যাই করি, তা যেন মার্কিন জনসাধারণের মহানুভবতা আর প্রীতির অর্থস্বরূপ ওদের মনে দোলা জাগায়।

একবার এক মোহাজের মন্তব্য করল, "তা, আপনার হাতের দস্তানাটা ভালো কিন্তু টুপীর ঈগল চিহ্নটা বাজে।"

আমি জবাব দিলাম, "না-হে, আমার ঈগলটাই ভালো। ঈগল ছাড়া আমার হাতে ডাক্তরী দস্তানা শোভা পেতে পারে না, জানো। ঈগল হচ্ছে, আমেরিকার প্রতীক। আমেরিকার যে নৌ-বাহিনী আমি তারই একজন ডাক্তার। আর এই আমেরিকার নৌ-বাহিনীই তোমাদের নিরাপদে সাইগন দিয়ে যাচ্ছে।

রুগী দেখবার ফাঁকে এই সব কথাবার্তা হতো। কখনো কখনো আমার মনে হতো, কাজ না করে শুধু গল্প করে কাটানো যেতো। প্রায় সব সময় আমার দোরগোড়ায় একজন-দু'জন ছেলে শুয়ে থাকতো। কয়েকজন জায়গা করে নিয়ে ছিলো জীপে। আমি যখন ক্যাম্পে

পরিদর্শনে বেরুতাম কিংবা গির্জায় প্রার্থনা-সভায় হাজির হতাম। তখন এইসব 'ক্ষুদে ডুলী-রাও' পিছু পিছু ছুটতো।

উপাসনার পর ব্রেকফাষ্ট। সাধারণতঃ আমার কোয়ার্টারে ফিরে এসে কফি তৈরী করে ক্রেকার দিয়ে খেতাম (প্রথম দিকে যে ক'খানা ফরাসী আর ভারতীয় রেস্তোঁরা ছিল সে গুলোতেই ভারী কিছু দিয়ে প্রাতরাস সারতাম)।

ছ'টা কিংবা তার কিছু পরে হাজির হতাম রুগী দেখার তাঁবুতে। এসে হরেক রকম রোগের চিকিৎসায় মেতে উঠতাম। আমি আসবার আগেই ওরা 'কিউ' দিয়ে থাকতো। লাঞ্চের জন্যে চলে আসার সময় সেই 'কিউ'র কিছু অবশিষ্ট থেকে যেতো। তারপর চলে যেতে হতো এতিমখানায়। ওখানে মাদাম গাইর কিছু গরম খাবার বরাদ্দ থাকতো আমার বরাতে। আমি অবশ্য সঙ্গে করে পানি নিয়ে যেতাম। অতো সহজে তো আর নিজেকে অসুস্থ হতে দিতে পারিনে! একটার মধ্যে ক্যাম্পে ফিরে আসতে চেষ্টা করতাম। ভারি জরুরী ব্যাপার, ভিয়েৎনামী ভাষা শেখা! তারপর তিনটার পর তাপমাত্রা যখন একটু সহনীয় অবস্থায় ফিরে আসতো—এই একশো, কিংবা কাছাকাছি ডিগ্রিতে, তখন আবার রুগীপত্র দেখতে শুরু করতাম। লাইন যতো লম্বাই থাক, আমার চলে যেতে হতো হাসপাতাল তাঁবুর দিকে। সেখানে গিয়ে চেক করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি চলতো। কখনো বা অপারেশান। এতে সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টা পর্যন্ত বেজে যেতো। তারপর জীপে করে চলে যেতাম শহরের অন্য প্রান্তে। একটি মালগুদামে স্বদেশী প্রায় হাজার খানেক লোক থাকতো। ওদের দেখা-শোনা করতাম। ডিনার অনেক সময় এতিমখানায় সারা হতো। তারপর আটটার দিকে নিজের ডেরায় ফিরে যেতাম। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পানিতে স্পোঞ্জ করে শুয়ে পড়তাম বিছানায়। সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে তখন কেবল সকাল অবধি ঘুমোবার আকুতি। কিন্তু আমার ক্ষুদে পাহারাদার-ফেরেশতারা আমায় জাগিয়ে দিয়ে বাধিত করতে ছাড়তো না। কোথায় কোন রুগীর অবস্থা সাংঘাতিক, কোথায় নতুন উৎপীড়িত আর্তের আমদানি হয়েছে—অতএব, জলদি চলো!

এই আমার মূল জীবন ধারা। অবশ্য কিছু অদল-বদল যে হতো না, তা নয়। তবু এ ভাবেই আগষ্টের শেষ দিক থেকে মে মাসের মাঝামাঝি

পর্যন্ত কাটাই। এতে আমার বেশ কিছু ওজন কমে যায়। কয়েকবার ম্যালেরিয়া, অন্ত্রে চার রকমের পোকা আর মুখে বেশ বিরক্তিকর ব্রণ ওঠা সত্ত্বেও আমাকে দৈনন্দিন রুটিন মাফিক কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। হাত দুটো পীতাভ হয়ে থাকতো। কারণ পরিষ্কারক সলিউশান হিসেবে আমাকে এলকোহলের পরিবর্তে টিংচার অব মারথিউলেট ব্যবহার করতে হতো। ভিয়েৎনাম ছেড়ে আসবার পরও আমার হাত দুটোর পূর্বাবস্থা ফিরে পেতে আরও এক হপ্তা লেগেছিল।

আমার স্নায়ুতন্ত্রী ছিলো বেশ সতেজ। তেমন গণ্ডগোল দেখা দিতো না সহজে। যোয়ান বয়েস। স্বাস্থ্যটাও ছিলো ভালো। ঘুমুতেও পারতাম অকাতরে। তবু মানসিক চাপ এতো বেশী হতো যে, নিয়ন্ত্রন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত। যতোই আমি চেষ্টা করি এদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে ভেবে আমার কী হবে, ততোই যেন বিবেকের তাড়না বেড়ে ওঠে। বারবার মনে হয়, এই নৈরাজ্যের রাজ্যে আমি আর কতটুকু করতে পারব!

আমার কার্যভার শেষ হবার কিছু আগের থেকেই আমি আর উপসাগরে আমাদের যুদ্ধ জাহাজগুলোতে যেতাম না। ছোট বোটে করে সেখানে যেতে চার ঘণ্টা লাগতো। কম্যুনিষ্টদের গোলমালের জন্যে রাত্রিতে আমাদের লঞ্চগুলো চলাফেরা করতো না। দিনের বেলা আবার কাজ থাকতো। কিন্তু শাওয়ারে গরম পানিতে গোসল আর চমৎকার এক বেলা খাওয়া আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠতো এক এক সময়। একদিন আর থাকতে না পেরে (ওয়াকী টাকী) মারাতে কম্যাণ্ড-শীপের হেলিকোপ্টার-খানা চেয়ে পাঠালাম। স্কিপার শুধোলেন, ব্যাপার কী? সাহসের সাথে জবাব দিলাম, "সার, আমার এক্ষুণি গরম পানির গোসল আর ভালো খাবার দরকার।" শুনে হাসলেন তিনি। আসলে সমস্ত টাস্ক ফোর্স আমার গোসল করার অসুবিধার কথাটা জানত। ফ্লাগশীপে পৌঁছুলে এডমিরাল সাবিন আমাকে তাঁর কেবিনে লাঞ্চ খেতে ডাকলেন। আমার পরণে একটু ভালো খাকি জামা আর ট্রাউজার। মারথিওলেট মেখে তখন আমার হাত পীতাভ হয়ে রয়েছে। আর আমার তখন গোসলের একান্ত প্রয়োজন। তবু, সেই হোমড়া-চোমড়া অফিসারদের সামনে এডমিরাল আমাকে তাঁর মুখোমুখি আসনে বসালেন। সবাই আমাকে তারিফ করে

কুলিয়ে দিল। শুধু এডমিরাল দিলেন খাটো করে। বললেন, "কিছু মনে করো না, ডাক্তার। তোমার কাছ থেকে এমন গন্ধ আসছে! যতো পারো দূরে থাকো।"

মনটা ভীষণ দমে গেল। ছোট ছেলেরা যেমন ঠাট্টা মশ্‌করা নিয়ে মাথা খারাপ করে, ঠিক সে রকম। আমি তখন বেকারের সঙের মতো দেখতে পোষা হনুমানটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওটি তখন আপন মনে আমাদের ট্রাকের সীট চিবিয়ে খাচ্ছিল।

মাসের পর মাস গড়িয়ে চলে। মোহাজের আগমনের সংখ্যা বেড়ে উঠতে থাকে। উত্তর ইন্দোচীনের সমস্ত প্রদেশ থেকেই ওরা আসছিল। কোনোদিন শ' খানেক, কোনোদিন বা হাজারের উপর। কেউ আসে স্থলপথে, কেউ বা জলপথে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা জলযানে। ক্যাম্প দা লা প্যাগোদায় আর স্থান-সংকুলান হয় না। নতুন ক্যাম্প পরে তোলা হল। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তিনটা নতুন ক্যাম্প হল। ত্রিশ হাজার লোকের ঠাঁই হল ওখানে। ক্রমে ক্রমে আমার ফোরম্যানরা সব চলে গেল। রইল কেবল নরম্যান বেকার। সেই অসম সাহসী দোভাষী। অবশ্যি, কাজ তার দোভাষী-গিরি ছাড়া বাকি সব। এডমিরাল স্যাবিনের সেই লাঞ্চ পার্টিতে বেকারের কথা আমি তুলেছিলাম। বলেছিলাম, "দেখুন স্যার, ফরাসী আমি আগেই বলতে পারতাম। এখন ভিয়েৎনামীও পারি। তাই দোভাষীর দরকার আমার হয় না। কিন্তু বেকার সব কাজের কাজী। তাই ওকে নানা ছুতোনাতায় রেখে দিয়েছি।"

এডমিরাল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, "বেশ, ভালো কথা। তোমাকে আমি নিরাশ করতে চাইনে। তুমি তো আমাদের ফাঁকি দিচ্ছ না। আমি জানি, তোমরা সবাই খুব ভালো কাজই করেছ।"

ইতিমধ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, জাহাজ থেকে এটা-সেটা নিয়ে ওদিকে চালান দিই বলে। "দেখুন, ডক্টর ডুনীর কাণ্ড। ঘাট ড্রাম তেল তিনি নিজের নামে সই করে নিয়ে গেছেন। কী করবেন এতো তেল দিয়ে?" এডমিরাল বললেন, "হু, কিন্তু দ্যাখো আমি জানি ওর ভীষণ দরকার। তা না হলে সে নিতো না, তা জানো?"

এছাড়া জাহাজের লোক নিয়ে কাজে খাটানোর ব্যাপারে তাঁর সাহায্য না পেলে কিছু তই চলতো না আমার। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একবার চারজন ভলান্টিয়ার চেয়ে পাঠালাম 'সাময়িক অতিরিক্ত ডিউটি' দেবার জন্যে। ক্যাপ্টেনের এতে সম্মতি ছিল না। আমি এডমিরালের বরাবরে

আর্জি পেশ করলাম। আর্জিটা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে পৌঁছেছিল; কারণ, শীগগির চার জন লোক এসে কাজে লেগে গিয়েছিল।

ফ্লাগশীপে বসে আমাদের সেই যে আলাপ, তারপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। এডমিরালের কাছ থেকে একটা বিধি পেলাম। তাতে তিনি আমাকে 'লিজিওন অফ মেরিট' খেতাব দেবার জন্যে সুপারিশ করে লিখেছেন, "পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আছে যারা নিজেদের সাহায্য করে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। আমার এটা মনে হয়েছে, ইন্দোচীনে বাস্তুত্যাগের সময় তুমি আল্লার কাজে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছ।"

আমার কাজের স্বীকৃতি দিতে এডমিরাল কখনো দ্বিধা করেননি। এভাবে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি না পেলে আমার কাজ হয়তো অসম্ভব থেকে যেতো।

এপ্রিল মাস থেকে বাস্তুত্যাগের সংখ্যা কমে আসে। স্পষ্ট বুঝা যায় ভিয়েৎনামের নতুন কর্তারা তাদের যবনিকায় যে সব ছিদ্র ছিলো, তা ভালো রকমেই এঁটে দিয়েছেন। ফরাসী সৈন্যবাহিনী তাদের তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে গেছে। শুধু হাইপঙ সীমান্তে কয়েকজন ফরাসী সৈন্য ক্যাম্প করে আছে। 'অপারেশান কক্রোচ' যাকে মোলায়েম করে বললাম, 'স্বাধীনতার পাড়ি' (প্যারেড্ টু ফ্রিডম), এখন তার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদিন আমার কাছে জাহাজ থেকে হেলিকোপ্টার পাঠানো হয়েছিল। কম্যুনিষ্টরা তখন খুব কাছাকাছি এসে ঘাঁটি করে রয়েছে। এই প্লেনটিকে নিতে হলো শহরের ছোট্ট এক কোণে।

হাইপঙের পতন আসন্ন। প্রতিটি বাড়ীর-দোকানপাট শূন্য হয়ে যাচ্ছে। প্রথম যখন আসি, তখনই হাইপঙের পথঘাট যানবাহনে ভরপুর আর তখন শুধু দু'চারখানা উচ্চাদস্থ সরকারী কর্মচারীর গাড়িই রাস্তায় চলাচল করছে। সেই চমৎকার বাজারটা "একসিডেণ্টে" পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। এ যে ভিয়েৎমীন কম্যুনিষ্টদের কাজ, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ম্যাগ-এর যে স্বল্প কয়েকজন অফিসার ছিলেন, তাঁরাও চলে গেছেন। রয়ে গেছেন শুধু বিমান বাহিনীর মেজর রাল্ফ ওয়াকার। শেষের দিকে মাইক ওয়ার্কারের জায়গায় এসেছিলেন রোগার একলি। তবু

পরিচালনার ব্যাপারে তিনি নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেছিলেন।

মিলিটারী এটাচী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর মেজর জন ম্যাক-গাউয়ান। একেবারে শেষদিন অবধি তিনি ছিলেন। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে যাঁরা কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট একজন। সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও তিনি একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতেন। আর বজায় রাখতেন তাঁর লঘু পরিহাস-প্রিয়তা। জন ম্যকগাউনের মতো লোকের সঙ্গে কাজ করে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার সমস্ত কর্মোদ্যমের পেছনে এঁদের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল। কখনো তন্দ্রা পেলে, অলসতা ঘিরে ধরলে আমি অন্যান্য মার্কিন অফিসারদের কাজ দেখে বেড়াতাম। তখন মনে একটা অপরাধবোধ জেগে উঠতো। আবার নতুন উদ্দীপনায় ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

এখন আমার সন্ধ্যা কাটে ক্যাম্পে মোহাজেরদের সাথে নানা গল্প-গুজব করে। এখন তাদের নিজেদের ভাষায়ও কোনো বাধা নেই। অথবা শহরে চলে যেতাম। সমুদ্র-তীরের পরিত্যক্ত দালানগুলোর পাশে আমি আর জন নানা তর্কে প্রবৃত্ত হতাম। আমি, নেভীর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, সে নিয়ে, কোনোদিন বা মদ আর মেয়ে মানুষের মতো মহৎ বিষয়ে আমাদের আড্ডা জমে উঠতো। কোনোদিন-বা আত্মীয়-স্বজন কারু প্রেরিত 'টাইম' কিংবা 'নিউজউইক' নিয়ে ডুবে থাকতাম। সাইগনের দূতাবাস আমাদের জন্যে মাসে একবার-দু'বার মেল পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যেদিন মেল আসে, সেদিন তো আমাদের মস্ত খুশীর দিন!

আমরা বিস্তর ডি ডি টি ব্যবহার করতাম। তার সঙ্গে বেশ কয়েক হাজার গ্যালন লিনডেন ও অন্যান্য জীবাণুনাশক প্রতিষেধক মিশাতাম। পানির করগুলো দিবারাত্র চলতো। আমার বিশ্বাস ওগুলো এখন উত্তর কেরোলিনার সবুজ মাঠকে ভালো তৃণভূমি করার কাজে আসবে।

শহরের নাগরিকবৃন্দ যাঁরা বাস্তুত্যাগ করবেন স্থির করেছিলেন, সবাই চলে গেছেন কিংবা যাচ্ছেন। এখন যারা রইলো ওরা পুরো কম্যুনিষ্ট না হলেও কম্যুনিষ্ট সমর্থক। তাই এখন থেকে আমাদের প্রকৃত অসুবিধা শুরু হল।

গভর্ণর আর মেয়রের কর্মচারীদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই চলে গেছে। পথঘাট জনশূন্য। চারদিকে থমথমে

নীরবতা। হাইপণ্ডের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে উঠছে 'নতুন সমাজ'। সে সমাজে শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ছড়াছড়ি। এপ্রিলের দ্বিতীয় হপ্তায় প্রথম দাঙ্গা বাধলো। কয়েক শো 'ভিয়েৎমীন' ট্রাক কতকগুলো তথাকথিত মোহাজের নিয়ে এসেছিল। আমাদের ক্যাম্পে ওরা থাকতে চাইল না। ওরা চাইল শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে বাড়িগুলো দখল করে বসবে। ট্রাকগুলো আমি ব্রিজ পার হয়ে শহরে ঢুকতেই ফরাসীরা বাধা দিল। ওরা বললো, উনিশে মে'র আগে 'ভিয়েৎমীন'দের ওরা শহর দখল করতে দিতে পারে না। এ অধিকার তাদের জেনেভা চুক্তিতেই স্বীকৃত। কিন্তু ট্রাকওয়ালারা বললে, মোহাজের হয়েও তো তারা প্রবেশ করতে পারে। যে-কোন সময়েই পারে। কথা কাটাকাটির পর দু পক্ষই ধৈর্য হারাল। বোগাস মোহাজের দল জোর করে ব্রিজ পার হতে চাইল। ফরাসীরা অগত্যা কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ল। হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। কয়েকজন মোহাজের নিহত হলো,আহত অনেক। অনেক সৈন্যও আহত হলো। হ্যানয় বেতারের প্রচার-কর্তাদের পোয়াবারো। জোর প্রচার চালালো ওরা। আরো বেশী করে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্ভাবনা দেখা দিল।

আমার তখনো এক জটিল কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। সেই জুতো-পালিশের ছেলেরা এখনো শহরে রয়ে গেছে। আমার বন্ধু আর রক্ষীর গুরুদায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। একবার রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলে আসি। ভুলে আমার ক্যামেরাটিও ফেলে আসি। পরে গিয়ে দেখি, নেই। চুরি হয়ে গেছে। আমি ওদের জানালাম। ওরা তো ভীষণ ক্ষেপে গেল, এ্যাঁ, মার্কিন ডাক্তারের ক্যামেরা চুরি! আমার মনে হয়, ওদের দেশ যে কতকগুলো অন্য লোক এসে দখল করে নিচ্ছে, এতেও ওরা ভীষণ ক্ষ্যাপা। যা হোক কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার ক্যামেরা এসে হাজির। ওরা নিয়ে এল। বললে, খুঁজে পেয়েছে। হয়তো ওদেরই দলের কোন প্রিয়দর্শন চোর-স্বভাবের ছেলে তা চুরি করেছিল। বেচারা হয়তো জানতো না ক্যামেরাটি কার! এক সময় ওদের চলে যাবার সময় এল। আমি তাদের সান্ত্বনা দিলাম, সাইগনে জুতো পালিশের ব্যবসা ভালোই চলবে। চুরি-চামারি অবশ্য চলবে না ওখানে। জুতো পালিশের কথায় হয়তো ওরা আকৃষ্ট হয়েছে। আরেকটু বুঝিয়ে বললাম, "দ্যাখো, এখানে ভিয়েৎমীনরা এসে গেলে আর জুতোর পালিশ করা

চলবে না। ওদের ক্যানভাসের জুতো পালিশ করবে, সে আশার গুড়ে বালি।' একটু সন্দেহের চোখে তাকাল আমার দিকে, পরে ওরা একে অন্যের পানে তাকাল। না, মিথ্যে বলছিনে আমি। ওরা নিজেরাও জানতো ভিয়েৎমীনদের পরণে ক্যানভাসের জুতোই থাকতো। তখন ওরা টীকা নিয়ে নিল, গায়ে মেখে নিল ডি ডি টি। তারপর এপ্রিলের এক সকালে আমি আর বেকার ওদের ট্রাকে তুলে দিয়ে, বাকিগুলোকে রাস্তা থেকে ধরে নিলাম। প্রত্যেককে কিছু রুটি দিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া হলো। নিরাপদে ওরা সাইগন পৌঁছে গেল।

দশই মে 'ভিয়েৎমীনরা' এক কাণ্ড করে বসল। মার্কিন ডাক্তার বা মার্কিনরা যে জনসাধারণের কাছে ঘৃণ্য, তাই তাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সবুজ ট্রাকখানা চুরি গেল। এই এক-টনী ট্রাক খানা ডঃ এমবারসন পেয়েছিলেন হাইপঙের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে। ওরা পেয়েছিল ফরাসীদের কাছ থেকে, ফরাসীরা আবার মার্কিন সাহায্য বাবতই ওটি পায়। দশমাস ধরে নানা কাজে ট্রাকখানা ব্যবহার করছিলাম। এক দাঙ্গার সময় ট্রাকখানার এক পাশ ভেঙ্গে গিয়েছিল, অন্য এক বিক্ষোভের সময় যায় ওর জানলাগুলো। শেষের দিকে অতিরিক্ত টায়ার, গ্যাসোলিন, ট্যাঙ্কের মুখ, লাইট-বাল্বগুলো প্রায় চুরি যাচ্ছিল। বেকারের হনুমানটিও ভেতরের কিছু কিছু জিনিষ খেয়ে ফেলছিল। তবু ট্রাকখানা চলছিলো ভালোই। বর্ষার বৃষ্টির ছাট লেগে ভেতরটা এমন হয়ে থাকতো যে, পরিষ্কার জামা-কাপড় নিয়ে বসবার উপায় ছিল না। তবু গাড়িখানার সুবিধা ছিলো যে, যেখানে-সেখানে নেয়া যেতো। আর শহরের সবত্র পরিচিতও ছিলো। কেউ যাতে ভুল না করে বসে সেজন্যে মাইক এডলার বড় করে মার্কিন সাহায্যের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন গাড়ির গায়ে। তবু দশই মে ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর পাশের গাড়ি পার্ক করার জায়গা থেকে ওটি চুরি হয়ে গেল। শেষ রাতে দেখা গেল টাউন স্কোয়ারের পাশে ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে। পষ্ট বোঝা যায় 'ভিয়েৎমীন'দের কোনো কোনো গণ-বিক্ষোভের ফলে ওর এমন দশা হয়েছে। ওরা দেখাতে চায় ভিয়েৎনামবাসীরা আর নতুন 'রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম' যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী কোনো জিনিষের ধার ধারে না। আমি এতই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যেন কোনো বন্ধু বিয়োগের ব্যথা অনুভব করছিলাম। একবার মনে হল, ওটিকে সামরিক

কায়দায় সসম্মানে কবরস্থ করি। সাইগনের (ইউ, এস, ও, এম) এর অফিসাররা তখন হয়তো নতুন একখানা একটনী সবুজ 'ডজ' ট্রাকের জন্যে চিরকুট লিখছিলেন!

ক্যাথলিক মিশন এখন প্রায় শূণ্য। স্কুলের ছেলেমেয়ে, পুরোহিত, নান—সবাই চলে গেছে। রয়ে গেছেন শুধু এক বুড়ো পুরোহিত। ফাদার লোপেজ তাঁর তল্পি-তল্পা গুটিয়ে 'জেনারেল ব্রিউষ্টারে' করে পাড়ি-দিয়েছেন। তাঁর সাইকেলখানাও নিতে ভুলেননি। ফাদার ফেলিস জণ্ডিসে ভুগছিলেন। আমার ভিটামিন পিল, এ্যান্টিবাইওটিক আর ফেনোবার বিটলেও কাজ দিচ্ছিল না; তিনিও এপ্রিলের শেষ হপ্তায় একখানা এম্ব্যাসী প্লেনে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের বিদায় দিতেও আমার প্রবৃত্তি হল না। ওঁরা সবাই আমাদের পরম বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সবার ছিল পরম উদার, পরম সুন্দর হৃদয়। আমাদের এই ছোট মার্কিন সমাজটির প্রতি তাঁদের প্রীতির আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর। ফাদার ফেলিসই ছিলেন মিশন চার্চের প্রার্থনা সভার যাজক। তিনি আমায় বলতেন, আমার জুতোর শব্দ শুনেই তিনি আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারতেন। কারণ, সবসময় প্রার্থনা সভার সামনের সারিতে আমি হাজির থাকতাম।

বুড়ো দিশি পুরোহিতটাই এখন প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। হাইপঙের পতন অবধি তিনি তাঁর দায়িত্বের কাজ চালিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল, হাইপঙের পতনের পরও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন। তিনি জানতেন, এতে তাঁকে অত্যাচার সহ্য করতে হবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল, এখন তিনি বুড়ো, শহীদের শিরোপা নিয়ে যদি বেহেশতে যেতে পারেন, তবে তো খুশিরই কথা! কিন্তু শেষের দিকে ভক্ত-সংখ্যা একেবারে কমে যায়। মিশনের গর্ব ছিল তার প্রকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত মহিয়সী মরিয়মের মূর্তি। কয়েক যুগ আগে হাইপঙের ক্যাথলিকরা যখন একবার রোমে তীর্থ করতে যান, মহাত্মা পোপ তখন তার আশীর্বাদপুত এই মূর্তিটি তাঁদের দেন। প্রধান যজ্ঞবেদীর পাশে আরেকটি বেদীতে ওটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সবারই শ্রদ্ধার বস্তু মূর্তিটি। চার পাশে ছড়ানো থাকতো ফুল সাজি আর জ্বলতো মোমবাতির সেজ। চাষাভুষোরা দিনরাত মানত করতে। মূর্তিটি সরানো হবে

কিনা এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হতো। ফাদার লোপেজ আর ফাদার ফেলিস যখন হাইপঙ ছেড়ে চলে যান, তখন ওটি দক্ষিণে নেয়া উচিত হবে না পতনের দিন পর্যন্ত এখানে যারা রয়ে গেল, তাঁদের জন্যে রাখা হবে, এ নিয়ে বিস্তর তর্কাতর্কি চলে। অবশেষে তর্কের অবসান করেন একজন মার্কিনবাসী। নাম তাঁর নরম্যান পোঁলিস। একেবারে শেষের দিকে রোগার একলী জর্মনীতে আহত হন। আমাদের দূতাবাস নরম্যানকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। তাঁর কাজ ছিল বাস্তুত্যাগ পর্বের শেষদিকটা তদারক করা। বিশেষ করে উত্তর এলাকায় যেসব মার্কিন জিনিষ-পত্র রয়ে গেল—তাঁবু, গাড়ি, মার্কিন সাহায্যের চা'ল ইত্যাদি (ইউযান-এর কিছুই কম্যুনিষ্টদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নয়) পার করিয়ে নেয়া তার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সর্বশেষ মার্কিন এমব্যাসী-প্লেন এলো এগারোই মে। আসল বিমান-বন্দর তখন শত্রুর হাতে। সামরিক বাহিনীর একটি খালি জায়গায় ওটি অবতরণ করল। পাইলট ফাদার ফেলিসের কাছ থেকে একটি খবর নিয়ে এসেছিলো। "মরিয়মের মূর্ত্তিটি কি যথাযথ আছে না 'ভিয়েৎমীনরা' নষ্ট করে ফেলেছে?" নরম্যান খবরটা পেলেন। আমি আশা করেছিলাম, এই প্লেনে চলে গিয়ে নরক থেকে মুক্তি পাবো। একটা কনফারেন্স ডাকা হল। তাড়াহুড়ো করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম। একটা জীপ নিয়ে চলে গেলাম মিশনে। মিশন তখন জীর্ণ। দীর্ণ বুড়ো পুরোহিতকে বললাম, "মূর্ত্তিটা আমরা চাই। এমব্যাসী-প্লেনে ওটি দক্ষিণে পাঠানো হবে।" বুড়ো পুরোহিত মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঁ, তা তো হতে পারে না। ওটি এখানেই থাকবে।"

তাঁকে রাজী করানো গেল না। সম্মতির ভান করে বললাম, "ঠিক আছে, ওটি এখানেই থাক।"

একটু পরে তিনি যখন উপাসনায় মেতে পড়লেন দৌড়ে গিয়ে যজ্ঞবেদীর উপর থেকে মূর্ত্তিটি নিলাম। মার্কিন সাহায্যের একটি কম্বল ছিল ওখানে। ওটিতে মুড়ে সোজা চলে এলাম বিমান ঘাঁটি। এই কাহিনী লেখার সময়, সাইগনের বাইরে মোহাজেরদের জন্যে যে গির্জা তৈরী করা হয়েছিল, সেখানেই মূর্ত্তিটি শোভা পাচ্ছে বলে জানতাম। এভাবে আমাদের স্বর্গীয় মহিলা মরিয়ম মার্কিন সাহায্যের দৌলতে স্বাধীনতার পথে পাড়ি দিলেন।

অনেকে আমায় জিগ্যেস করেন থাকে হাইপঙের গোলমাল থেমেছিল কখন? তাঁদের জবাবে আমি বলেছি, ৪ঠা মে। চুক্তি অনুসারে মে-মাসের ৪ তারিখে কিছু সৈন্য আর 'ভিয়েৎমীন' বিশেষজ্ঞ দলের প্রবেশাধিকার ছিল। এসে ওরা গভর্ণরের অফিস সিটিহল ও অন্যান্য অফিসগুলোয় গিয়ে সব কিছু বুঝে নেবে। আর এখান থেকে শেষদল সরে আসবে। সুতরাং হঠাৎ করে সরে গিয়ে ইলেকট্রিসিটি, পানি বন্ধ হয়ে যাবার কোনো আশঙ্কা ছিল না। অন্ততঃ কাগজে-কলমে এই হস্তান্তর পর্ব ধীরে-সুস্থে-হবার নির্দেশ ছিল।

চারশো আশিখানা রাশিয়ায় তৈরী শক্ত আনকোরা নতুন 'মলোটোভা' ট্রাকে করে কমিটির সবাই এলো। ওদের পরণে ছিলো শক্ত উঁচু কলারের গ্রে রঙের ইউনিফর্ম, মাথায় শোলার হেলমেট, পায়ে ক্যানভাসের জুতো। অনেকেই তাদের ভালো ফরাসী বলতে পারতো। আমি রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছি—হয়তো ক্যাম্পে কিংবা ডকে, তখন ডেকে ওরা থামাতো। এ রকম ব্যাপার দিনে প্রায় চারবার হতো। অবশ্য প্রতিবারই ওরা বেশ নম্রকণ্ঠে ভদ্রতার সংগে কথাবার্তা বলতো। মার্কিনীদের মধ্যে আমাকেই নাকি প্রথম ওদের ভাষা বলতে শুনলো। কি জন্যে শিখেছি? আমি কি এখানে থাকতে চাই? আমি কি 'ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনাম' প্রতিষ্ঠার পরও 'ভিয়েৎনামের সত্যিকার জনগণের' সেবা ও সাহায্য করতে থেকে যাব? এ ধরণের নানা কিছু ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করতো। আমি জবাব দিতাম, "আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি এবার ফিরে যেতে আশা করছি।"

তখন আমার ক্যাম্পে একটা ডেলিগেশান পাঠানো হল। ওরা এসে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কিছু নমুনা দেখিয়ে গেল। তাদের নেতা বলল, "আপনি যখন আমেরিকায় চিকিৎসা করেন তখন কি 'ডিমোক্রাট' আর 'রিপাবলিকান' ভেদাভেদ করেন?"

"কক্ষনো না।"

"বেশ, তাহলে এখানেও তো ধনবাদী অনুচর আর সত্যিকার ভিয়েৎমীনদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়।" এই বলে সেই জবুথবু গালওয়ালা বাষ্টার্ডটা তার লোকগুলোকে আদেশ দিল আমার ঔষধপত্র আর ডাক্তারী অস্ত্রশস্ত্র যেন দু'ভাগে ভাগ করে। অর্ধেক

আমার জন্যে আর বাকিটা 'ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামের' জন্যে। আমি কিছু করতে পারলাম না। এই নবাগতদের কাছে আমি নম্র হয়ে থাকতে চেয়েছিলাম, তাতেই হয়তো ওরা বুঝে গিয়েছিল যে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। আর সত্যি আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম শুধু কোথাও ওরা আমায় তালাবন্ধ করে না রাখে এ জন্যে। তারপর হয়তো বছরের পর বছর খুঁজে-পেতেও কেউ বার করতে পারবে না। কম্যুনিষ্টদের এই কীর্তির কথা সব মার্কিনবাসীদের জানা। আর উত্তর ভিয়েৎনামে তখন আমরা মাত্র চারজন মার্কিনী!

ওদের বিশেষজ্ঞদলের আগমনে কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি। কিন্তু গোলমাল দেখা দিল ওদের সঙ্গে রক্ষীরূপে আগত কয়েক হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে। ওরা এক-একটি গ্রাম নরকে পরিণত করে ছাড়ল। ওরা আসার পর থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গমা, 'স্বতঃস্ফূর্ত' বিদেশী রোধ বিক্ষোভ, মেয়ে-পুরুষে মারামারি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হ'ল। নবাগতরা নাকসিঁটকে সব দোষ ফরাসীদের ঘাড়ে চাপাল। সিটি জেলের সামনে একদিন দাঙ্গা বাধল। বিশেষজ্ঞের দল দাবী জানাল, সমস্ত বন্দীদের অনতি বিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ফরাসীরা জবাব দিলে, মুক্তি পাবে, তবে ঘোলোই মে'র আগে নয়। চুক্তির শর্তানুসারে সেদিনই মুক্তি পেতে পারে। বিক্ষোভ থামাবার জন্যে জনতার উপর কাঁদুনে গ্যাস আর গুলী চালাতে হল।

একদা বিকেল বেলায় আমি মিশনের চুড়োয় উঠলাম। শহরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। শহরের আটটি জায়গায় তখন কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে ধূমায়িত গণবিক্ষোভ ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। ফরাসীরা জনতাকে বিচ্ছিন্ন করবার শেষ অস্ত্রস্বরূপই এই মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করছিলো। এই শেষের দিনগুলোতে জেনারেল কগনীর সেনাবাহিনী মাথা ঠাণ্ডা রেখে খুব ভালো কাজই করেছিলো। তাতে অবস্থা চরমে ওঠার অবকাশ পায়নি। আর নিজের কথা বলতে গেলে, আমি শুধু এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা এড়িয়ে বেড়াতাম। গাড়িটা চুপিসারে আমার গন্তব্য-পথে চালিয়ে নিতাম, কেউ যাতে থামাতে কিংবা প্রশ্ন করতে না পারে। বেশ ভয়ে ভয়েই আমার দিন কাটতো। মে মাসের দশ তারিখ আমরা শিবিরের তাঁবুগুলো গুটিয়ে ফেললাম। অবশিষ্ট মোহাজেরদের শূন্য দালান-

কোটাগুলোতে চালান দিলাম। বারোই মে শেষ বারের মতো মারাত্মক কাণ্ড দেখলাম।

'ভিয়েৎমীনদের' হাইপঙের সামান্য অংশ নিয়ে থাকার কথা। আসলে ওরা কিন্তু গোটা হাইপঙ দখল করে বসে আছে। যেখানে সেখানে তাদের রক্ষীর ছড়াছড়ি। সদর রাস্তা থেকে শুরু করে প্রতিটি অলি-গলি ওদের তাঁবে চলে গেল। ওরা প্রতি মোড়ে সেন্ট্রি বসিয়ে রাখল। ওরা একটি ভিয়েৎনামী ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটিও একটু ঘণ্ডা-মার্কা। কারণ তখনও সে চাচ্ছিল জোর করে 'ভিয়েৎমীন' এলাকা থেকে পালিয়ে আসবে। ভিয়েৎনাম যেখানে ভাগ হয়েছে যেটাকে ডি এম জেড্ (বা সামরিক বাহিনীবিহীন এলাকা বলে), তার পেছনের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সে। কম্যুনিষ্টদের হাতে পড়ে গেল। ওরা তাকে ঘিরে ধরে পায়ে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করতে লাগল। এভাবে ছেলেটি বেহুঁশ হয়ে না পড়া পর্যন্ত তাকে মারতে লাগল। ওরা যেন পলাতকদের প্রতি ওদের শাস্তির বহর দেখাবার জন্যেই মেতে উঠেছে। পরে হুঁশ ফিরে এলে ছেলেটি দেখতে পেল সে একা পড়ে আছে। চারদিকে রাস্তা বন্ধ। সে কোনো রকমে টেনে-হিঁচড়ে পাশের এক গলিতে ঢুকল। সেখান থেকে এক রিকশাওয়ালা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে আমাদের কাছে। আমার কাছে এক্স-রে'র কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। তবে এটা পষ্ট বোঝা গেল, তার পা আর ঠিক হবে না। মারের চোটে পায়ের গোড়ালি আর পায়ের পাতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার তখন সামান্য কয়েকটা যন্ত্রপাতি আর কিছু প্রোকেইন আর পেনিসিলিন ছিল মাত্র। আমি পায়ের গোড়ালি থেকে নীচের অংশ বিচ্ছিন্ন করে চিকিৎসার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। অন্য কেউ হয়তো আরও কিছু অংশ কেটে ফেলতো। তাড়াতাড়ি একটা দক্ষিণগামী ফরাসী এল, এস, এস-এ ওকে তুলে দিলাম। জন্মের জন্যে সে খোড়া হয়ে গেল। তবু সান্ত্বনা, সে এখন স্বাধীন।

বারোই মে'র উত্তপ্ত সকাল। আমাদের জিনিষপত্র পাঠানোর শেষ দিন। খালি পায়ে অসংখ্য লোক এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে। নিঃশ্বাস নেয়া যায় না। এতো ধুলো! তবু জায়গাটা প্রায় নিস্তব্ধ। থেকে থেকে এল, এস-টির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মোহাজেরদের আমরা সমানে ডি-ডি-টি স্প্রে করে চলেছি।

এই মে মাসের সকাল আমেরিকায় বাসন্তী-ভোর। কমনীয়তায়, সুগন্ধে আর কিছু কুয়াশা বৃষ্টিতে আমেজ-ভরা! এখানে কিন্তু গা-তাতানো রোদ। নদীর ধারা শুকিয়ে যাবার দশা। তার উপর মোজেরদের বোটকা গন্ধ ভারি বিরক্তিকর। আজ পাড়ির শেষ দিন। তিন হাজার ছয়শোর মতো মোহাজের সাইগনের পথে রওনা হচ্ছে। প্রত্যেকের সঙ্গে অসংখ্য তল্পিতল্পা আর মায়েদের কোলে অযুত শিশু। আস্তে আস্তে ওরা সারিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল যাতে ডি-ডি-টি ওদের গায়ে লাগে কিংবা এক টুকরা রুটি, কয়েকটা তোয়ালে বা কিছু কাপড় পায়। কিন্তু আমার কাছে ওরা ভাগ্যহত জন-সমষ্টি মাত্র নয়। তাদের মনের বল আমি জেনেছি। জানিনে কেন তাদের এই দশা। তবু সেই বেদনা-ভরা ক'টি মাস আমি তাদের কাছে থেকে তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিয়োগান্ত পরিণতির সাথে নিজকে মিলিয়ে দেখেছি। ওরা সব আমার উৎপীড়িত ভাইয়ের দল।

অবশ্যি, এই শেষ অভিযাত্রার মোহাজেররাই একেবারে শেষ নয়। সেই 'ব্যাম্বু কারটেইনের' অন্তরালে আরো অসংখ্য লোক রয়ে গেল, যারা বাস্তুত্যাগের কোনো সুযোগই পেল না। আমাদের দায়িত্ব যতটুকু পেরেছি আমরা প্রাণান্ত করে সমাধা করেছি। জেনেভার চমৎকার লেকের পাশে বসে যাঁরা চুক্তি-পত্র তৈরী করেছিলেন, তাঁরাও আমি আশা করি, আমাদের কাজের ফলাফলে খুশি হবেন।

খোদার ভালোবাসা, মহত্ব আর দয়ালুতায় বিশ্বাস করতে আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি জানি, স্বল্পমাত্রায় হলেও এসব গুণ মানুষের মধ্যেও সঞ্চারিত হতে পারে। কিন্তু এই একটি বছরে তার খুব কম নিদর্শনই আমার চোখে পড়েছে। নিজেকে আমি বোঝালাম, "যা দেখলাম, তা আমার স্মরণ পটে উজ্জ্বল করে রাখতে হবে। মনশ্চক্ষে আবার তার সন্দর্শন পেতে হবে। তাদের মধ্য দিয়ে আমায় বাঁচতে হবে। আজকের অনেক কিছু আগামী দিনের পাথেয়।"

শেষ জাহাজটা তখন ডক ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। ওদিকে আমি তাকিয়ে রইলাম। আমার মনে হল, সব কিছু বুঝি শেষ হয়ে গেল। অকারণ বেদনায় মন ভরে উঠলো। জাহাজ নদী বেয়ে চলে যাচ্ছে। উপরে সোনালি দ ঝিকমিক করছে।

দিয়েনবিয়েন ফু'র পতনের পর মোহাজেররা আমাদের তথা আমেরিকা সম্পর্কে যে ধারণা করেছিল, এখন তা করে না কেন, প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, টংকিনের গ্রামে যেসব ট্যাঙ্ক চষে বেড়িয়েছিল, যে সব ভয়াবহ বোমা ভিয়েৎনামের অসংখ্য কুটীর ধ্বংস করেছিল, যে সব বন্দুক, জীপ, ট্রাক, ইউনিফর্ম প্রভৃতি ওখানকার অধিবাসীদের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তার প্রত্যেকটিই ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী' শীলমোহরযুক্ত। আর ঐ যুদ্ধকে গণ্য করেছিল 'ঔপনিবেশিক যুদ্ধ' বলে। উত্তর ভিয়েৎনামের জনসাধারণ মনে করতো যুক্তরাষ্ট্র হল একটা প্রকাণ্ড মালগুদাম। এখান থেকে শুধু ফরাসী উপনিবেশবাদ রক্ষার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ হয়। আসলে হয়ে ছিলোও তাই। কতো হয়েছিল তার যথার্থ হিসাব আমার জানা নাই। তবে ইন্দোচীনের যুদ্ধে ফ্রান্সকে কয়েক শো মিলিয়ন ডলার সাহায্য বাবদ সামরিক উপকরণ দেয়া হয়েছিল জানতাম। এই সাহায্য দানের ফলে 'ব্যাম্বু কারটেইনের' দু'দিক থেকেই 'প্রোপাগাণ্ডা' শুরু হয়ে গেল। অবশ্য 'ভিয়েৎমীন' কম্যুনিষ্টরাই বিশেষ করে এগিয়ে এল। সম্ভবতঃ এজন্যে অনেকে মার্কিনবাসী 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' শব্দটিকে একটি বাজে শব্দ বলে গণ্য করে থাকে ('ইনফরমেশান' শব্দটা অনেক গ্রহণযোগ্য।) তাই বোধ করি গণতান্ত্রিক দেশের চাকার গতি এতো আস্তে চলে। আর ওদিকে কম্যুনিষ্টরা একটি মুহূর্তও বিনষ্ট হতে দেয় না। 'ভিয়েৎমীনদের' একটি 'সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট' ছিল। দিয়েনবিয়েন ফু বিজেতা জেনারেল জিয়াপ এর পরিচালক। অন্যান্য কর্মচারীরাও ছিল বেশ সুদক্ষ। তাই প্রতিষ্ঠানটি খুবই চালু ছিল। বড় বড় নেতা, মান্দারিন কিংবা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর জন্যে ওখান থেকে প্রচারণা চালানো হতো না। ওদের প্রচারণা বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিল ওই এলাকার দিন মজুরদের জন্যে। তাতে ওরা অসম্ভব সাফল্য অর্জন করেছিল।

কিন্তু যে সব এলাকায় পাঁচ, ছয় কিংবা সাত বছরের জন্যে ভিয়েৎমীনরা ক্ষমতায় ছিলো, সেখানে আর প্রচারে কোনো কাজ দিল না। 'ভিয়েৎমীন' শাসন যে একটা বিরাট ভাঁওতা, পেট খালি রেখে ওরা ভালো রকমেই বুঝতে পারল। কম্যুনিষ্টদের 'উচিৎ শিক্ষা' লাভের ফলে তাদের ছেলেমেয়েদের যে মনের অসুস্থতা শুরু হয়েছিল, ওরা তা বুঝতে পারল। তাতে বর্তমান পরিস্থিতি আরো অনেক খারাপ মনে হল ফরাসীদের চাইতেও। অবশ্য অধুনা যে সব এলাকা 'ভিয়েৎমীনরা' জয় করে নিচ্ছে কিংবা জেনেভা-চুক্তির ফলে পাচ্ছে, সেখানে কম্যুনিজমের মোহ এখনো পুরোমাত্রায়। ওদের অনেক নীতির জন্যে এসব এলাকার সাধারণ মানুষ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। বিশেষ করে ভূমি-সংস্কারের প্রতিশ্রুতি তাদের মন কেড়ে নেয়। ভিয়েৎনামের জনগণ আশি বছরের উপনিবেশবাদের বোঝা বহন করে চলেছে। তাতে ওরা পর্যুদস্ত। কম্যুনিষ্টরা এক 'নতুন জীবনধারার' পথে তাদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করল। গণতন্ত্র তাদের কিছুই দিল না—যদিও অন্ততঃ দু'টো জিনিষ, বিচার আর স্বাধীনতা—তার দেবার ছিল। কম্যুনিষ্টরা যে 'ভোটে' জয়যুক্ত হয়ে ক্ষমতা লাভ করেছে তা আমি বোঝাতে চাচ্ছিনে, আমি শুধু বলতে চাই, ওরা একটু বুদ্ধি-বিবেচনাযুক্ত শক্ত ধরণের প্রতিপক্ষও পায়নি।

ইন্দোচীনের দু'এলাকার লোক কখনো একত্র হতে পারতো না। কম্যুনিষ্টরা তাদের অধিকৃত এলাকায় প্রথমেই ভ্রমণ-নিয়ন্ত্রণ আইন জারী করে। এতে তাদের নতুন 'জীবন ধারা' সম্পর্কে সত্যিকার মতামত প্রচার লাভ করতে পারেনি। তাই স্বাধীন এলাকার বিভ্রান্ত জনসাধারণ ঐসব এলাকার অধিবাসীদের বলতো, "ভিয়েৎমীন-শাসন কায়েম হলে আমাদের দিনও ফিরে যাবে। ওরা যেসব পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের কঠোর পরিশ্রম যোগ করে দেশকে আমরা স্বর্গে পরিণত করবো। তোমরা বড্ড অলস, বেশীক্ষণ কাজ করতে পারো না। তোমাদের উন্নতি হবে কিসে? ফরাসীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেলে দেখো আমাদের অবস্থা ফিরে যাবে····।"

প্রশ্ন জাগে, ওরা যদি নতুন শাসনব্যবস্থার জন্যে এতোই কাতর হয়ে পড়ে আর ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির অংশ হিসেবে মার্কিনদেরও ঘৃণা করে থাকে, তাহলে এতো লোক বাস্তুত্যাগ করছিল কেন? সহজ জবাব।

ওরা মার্কিন আশ্রয়ে আসছিলো দুটি আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। প্রথম বিপদ আসছিলো তাদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর হামলার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়তঃ, 'সাম্রাজ্যবাদী' মার্কিন জাহাজে তাদের নিরাপত্তা বেশী।

ভীয়েৎমীনরা ওদের ধর্মের উপর হামলা চালিয়েছিল। ওদের গির্জা বন্ধ করে দিয়েছে, পুরোহিত, যাজকদের হত্যা করেছে কিংবা মাঠে কাজ করতে বাধ্য করেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা কিছু করেছি বলে নয়, শুধু এই জন্যেই ওরা আমাদের সংগে সংযোগ স্থাপনের সংকল্প করেছিল। তাতে করে ওরা যেন দক্ষিণে গো দিন দিয়েমের শাসনে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতার আশ্রয়ে চলে যেতে পারে।

আমি দেখতে চেষ্টা করেছি, টংকিনবাসীরা প্রথম যখন আমাদের ক্যাম্পে এল, তখন আমাদের বিরুদ্ধে ছিল ওদের প্রচণ্ড ঘৃণা। কারণ আমাদের সম্পর্কে ওরা অনেক কিছু শুনেছে। পরে অবশ্য এসব মিথ্যায় অবিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো গতি রইল না ওদের। খুব কম মোহাজেরই প্রথমটায় হাসিমুখ নিয়ে এসেছিল। ভীতি জর্জরিত হয়ে নেহাত অনিচ্ছায় ওরা এসেছিল। গোড়ার দিকে আমাদের কাছ থেকে দৈনন্দিন আহার নেয়া থেকে শুরু করে পেনিসিলিন খেতেও ওদের দেখা যেত অনিচ্ছা। অনেকে আবার আমাদের ইউনিফর্ম দেখলেই ঘাবড়ে যেত। ক্রমে কাজের মধ্য দিয়ে আমরা ওদের প্রীতি আকর্ষণ করলাম। তখন সাহায্য করতেও ওরা দ্বিধা করল না। আমি নিশ্চিত হলাম, ওরা বেশ বুঝতে পারল যে, আমরা ওদের সাহায্যের মারফত যে প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারছি, তা শুধু আমাদের যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বাহিনীর দৌলতে। তাই বেকার আমাকে স্যালিউট দিয়ে বলতো, "কায়ান হি!" মানে, লেফটেনাণ্ট। ডাক্তার বলার চাইতে এটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিল। আমরা যে এতো কিছু করতে পারছিলাম, তা শুধু মার্কিন নৌ-বাহিনী আমাদের সুযোগ দিয়েছিল বলে। মার্কিনবাসী বলে তখন আমাদের মনে গর্ব বোধ হল। আমাদের জাহাজে করে আমরা ওদের স্বাধীনতার আলোকে নিয়ে এলাম। ডাক্তারী সাহায্য দিয়ে তাদের অসুখ সারালাম। তাদের ক্ষত সারিয়ে দিলাম। আমার সামান্য একটু কথায় যে সব মার্কিন প্রতিষ্ঠান অসংখ্য সঞ্জীবনী ঔষধ-পত্র পাঠিয়ে ছিল, তাতে ওদের জীবন রক্ষা হয়েছিল। ভিয়েৎনামে আমরা এসেছিলাম

অত্যন্ত শেষ সময়ে। তবু আমরা এসেছিলাম বন্দুক আর বোমা নিয়ে নয়, ভালোবাসা আর সাহায্য নিয়ে।

সভ্যতার দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির কাছ থেকে আমি এই বই লেখার প্রেরণা পেয়েছি। বিদেশীর তাঁবে সেই ব্যথাজর্জর হতভাগ্য জনসাধারণ, যাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ও ভালোবাসায় এমন পেলব, বিশ্বাসে অনড়, ওরা হল আমার প্রেরণার প্রাণ উৎস। অন্য উৎস আমার নৌ-বাহিনীর বন্ধুরা। সেই পনেরো হাজার নাবিক আর অফিসাররা—যাঁরা প্রীতি আর যত্ন দিয়ে হতভাগ্য ভিয়েৎনামীদের সেবা করেছিল। বিনা আদেশেই ওরা এসব করতো। কেন না এই অসহায় মানুষগুলোকে সেবা করে ওরা নিজেরাই তৃপ্তি পেত। পৃথিবীর কোথাও একযোগে সব ভালো মানুষ পাওয়া যাবে না। ওরাও হয়তো তা নয়। ওরা যখন সমস্যার মুখোমুখি হল, তখন ব্যাখ্যা খুঁজল। তাও যখন পেয়ে গেল, ব্যাপারটা বুঝতে পারল। নির্যাতনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হল। আর তা উপশম করতে প্রাণান্ত প্রয়াস পেল। প্রতিটি মোহাজেরের হৃদয় জয় করতে ওরা সমর্থ হয়েছিল। হৃদয়ের যে অফুরন্ত উদ্যম আর ঔদার্য নিয়ে আমাদের নৌ-বাহিনীর লোকেরা তা করছিল, তা আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

কয়েকটি জাহাজের নাম এ প্রসঙ্গে আমার স্মৃতি-পটে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। প্রথমেই নাম করা যেতে পারে 'দি মণ্টেগু এ কে এ-৯৮'। তারপর ছোট এ পি ডি-গুলো, যেমন 'দি বলডাক ১৩২', 'দি কুক ১৩০' 'দি ডায়াশেংকো ১২৩' আর কদাকার এল এস টি ৮৮৫, ১০৯৬ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। নৌ-বাহিনীর কয়েকজন কর্মচারীর কথাও আমি কখনো ভুলতে পারব না। তাঁরা হলেন পেটেকসী এইচ এম ও, নরম্যান বেকার এ বি এম ও, ডেনিস শেফার্ড এইচ এম ও, কম্যাণ্ডার লে ফর্জ, লেফটেনাণ্ট এইচ, এস, হেয়ডেন, লেফটেনাণ্ট জনী ফুসকো, লেফটেনাণ্ট জনী ওয়াকার, লেফটেনাণ্ট টেডটরোক আর লেফটেনাণ্ট হাল জিম্মারম্যান। কয়েকজন চমৎকার কমোডোর, বিশেষ করে ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার উইনের কথাও আমি মনে রাখব।

আমার সেই ধৈর্যধী, সহানুভূতি প্রবণ অধিকর্তা এডমিরাল লোয়েঞ্জো এস. স্যাবিনের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ্য। আমার জন্যে অনেক সময় হয়তো তাঁকে ভাবনায় কাটাতে হয়েছে—জুনিয়র গ্রেডের এই লেফটেনাণ্টটা

হাইপণ্ডে বসে কী যে ছাই-ভস্ম করেছে, আইন-কানুনের ধার কাছ ঘেঁষে না, সব সময় এটা-সেটা নিয়ে যায়, এটা-সেটার দাবী করে! এমন ভাবে কাজ করছিলাম, আমি যেন আমার ট্রাইপণ্ডলোর উপর আরো অতিরিক্ত কয়েকটা পোঁচ লাগিয়েছি। এসব সত্ত্বেও এডমিরাল সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েই এসেছেন। তাঁর অধীনস্থ লেফটেনাণ্ট ফ্রয়েড এ্যালেন, মেজর এন, আর স্মিথ চুরুটখোর মেজর জনকেলী আমাকে কোনো ব্যাপারে সাহায্য করতে কার্পণ্য করেননি। প্যাটলেডউইজ, এনসাইন চালিক্রশ, আর বচ এ্যাউট—এই তিনজন লেফটেনাণ্ট আমার সঙ্গে থাকতেন। আমাকে পরিষ্কার কাপড় ধার দিতেন, কখনো বা আমার মানসিক ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করতেন। লেফটেনাণ্ট ডন ষ্টিবিচের তরুণ মনের উদ্দীপনা আমার উৎসাহের উৎস। লেফটেনাণ্ট আল মোফেল আমার জানা খাঁটি লোকগুলোর মধ্যে একজন। প্রয়োজন মাফিক সাহায্য করতে তিনিও কখনো দ্বিধা করতেন না।

আমার আইরিশ রক্ত কখনো কখনো গরম হয়ে উঠতো। উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করতে যে কূটনীতির প্রয়োজন তা আমি পেতাম কম্যাণ্ডার ওয়াণ্ডেল ম্যাকীর কাছ থেকে। লেফটেনাণ্ট এভারটের কথাও আজ মনে পড়ছে। মাদাম গাইর এতিম বাচ্চাদের তিনি বড্ড ভালোবাসতেন। তাদের জন্যে অনেক কিছু করেছেন। সিভিলিয়ানদের মধ্যে মাইক এডলার আর রোগার একলীর কথাও আমি প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করব। হাইপণ্ডে আমার সহযোগী বিমানবাহিনীর মেজর বাফ্ফ ওয়াকার আমার কাছ থেকে যতো সাহায্য পেয়েছিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকে অধিকতর সাহায্য পেয়েছি। আরেকটি নাম আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সে আর্মী-মেজর জন ম্যাক গাউনের। সামরিক কেতাদুরস্ত লোক। একজন খাঁটি ক্রীশ্চান আর সত্যিকারের দার্শনিক গোছের লোক ছিলেন তিনি। অনেক রাত অবধি উনি আমাকে সামরিক আর সাধারণ নীতির কথা শুনিয়ে কাটাতেন। অনেক বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অস্পষ্ট এবং আমি তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণও করতাম না। কিন্তু তাতে এ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবার প্রকৃতি আমার বেড়ে যেতো। যুদ্ধ, সাম্যবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় তিনি ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তাঁর নানা যুক্তি-জালের পাল্লায় পড়ে আমার বিচারশক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি সব সময় আমাকে

কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে চাইতেন। তার মধ্যে গুরু-গিরির কোনো ভাব দেখা না গেলেও আমরা কখনোই বলতাম না যে, তিনি আমাদের শেখাচ্ছেন না। তাঁর কাছে সত্যি আমি ঋণী! এ বইতে প্রশংসনীয় কিছু থাকলে তার অধিকাংশ তাঁরই প্রাপ্য। ধন্যবাদ, জন!

ইন্দোচীনের অভিজ্ঞতার পর আমি জাপানের হাসপাতালে ফিরে গেলাম। ওজন নিয়ে দেখি এক শো কুড়ি পাউণ্ডেরও কম। আমার ছ'ফুট লম্বা দেহটা তখন তাল পাতার সেপাইর মতো দেখাচ্ছিল। মেডিক্যাল সার্ভিস কোরের কম্যাণ্ডার আমার দিকে একবার তাকিয়ে দু'হপ্তার ছুটি দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, দুটো আদেশ তামিলের হুকুম দিলেন। প্রথম হলো প্রচুর তাজা মাংস খাওয়া আর একটি বই লেখা। বেশ একটু গম্ভীর ভাবেই তিনি আদেশ দিলেন। চালি, প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি। এই আমার বই!

আমাদের টাইপিষ্টরা বিরামহীন কাজ করেছে। তাদের, বিশেষ করে, এলমো মিমস আর জো পলিক্রোনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

হাওয়াই দিয়ে ঘরমুখো হবার সময় নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন ডব্লু. লেডারের সঙ্গে আমার দেখা, সম্পাদকীয় দপ্তর আর প্রকাশনা জগতে তিনি সুপরিচিত। তিনি আমাকে আসল কাজে এগিয়ে দিলেন। ঠিক জায়গায় হানা দিয়ে আমার পাবলিশার খুঁজে বার করলেন। তাইতো আমার ভিয়েৎনামের কাহিনী আজ দিবালোক দেখতে পেয়েছে।

সাইলাস স্পেংগলার আর জো আলবানিজ কখনো ভিয়েৎনামে ছিলেন না। কিন্তু ওঁরা ওখানকার ঘটনা আর এই অধম ডাক্তারের কাজ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতেন। আমার দুঃখ কোথায় ওঁরা জানতেন। আমার এই বইর পাণ্ডুলিপি ঠিক করতে গিয়ে, এর ওপর উপদেশ দিতে গিয়ে, ওঁরা অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন। কখনো আমি যখন নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম, তখনও আমার ওপর তাঁদের আস্থা থাকতো অপরিসীম। তাদের সঙ্গ পেয়ে গর্বে আমার মাথা উঁচু হয়ে যেতো, আকাশ চুম্বী হতো। অবশ্য পা ঠিক খোদার জমীনেই পোঁতা থাকতো। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁদের জন্যে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা সীমাহীন।

সব শেষে আমি নাম করব (ইউনর-এর) লেফটেনাণ্ট নর্টন ষ্টিভান্সের। 'সে আমার সবচেয়ে' বেশী ধন্যবাদের পাত্র। সে আর আমি একই সঙ্গে

ইন্দোচীনে আর জাপানে চাকরী করেছি। সেই ভীষণ দুর্যোগের দিনগুলোতে আমরা একই সাথে কাটিয়েছি। অনেকগুলো রাত সে আমার পাশে বসে থাকতো, বলতো, "ও, কে, টম, অনেক দূরে এগিয়ে এসেছো, এবার একটু ধীরে চলো—ভালো লাগবে। এখন যা দেখে মন মুষড়ে পড়ছে, তাতে দেখবে আবার আলো দেখা যাবে। সময় এলে এতেই তুমি মহত্ত খুঁজে পাবে।" তোমায় ধন্যবাদ নর্ট, জাপানে যা বলেছিলে, আজ তা' সত্যি হয়েছে। সেই কুয়াশা-ঘেরা রাত আজ আর নেই।

এঁদের সবার সম্পর্কে যে কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তা হল, সবাই ভালো মার্কিনবাসী। নিজের সম্পর্কে জোর দিয়ে বলতে পারি, তাঁদের বন্ধু হিসেবে আমি পেয়েছিলাম। আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ততার জন্যে যদি মাফ চাইতে হয়, তাহলে তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দোব :

"বনানীর শোভা ঘনান্ধকার,
তবু সুন্দর
কিন্তু প্রতিশ্রুতি আমায় রাখতে হবে
ঘুমিয়ে পড়ার আগে
যেতে হবে দূরান্তরে।"

শেষ